আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ

বিবাহ-বিপ্লব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভাদ্র—১৩৩২
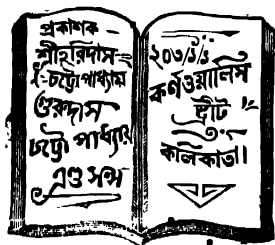
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি; এল।

ভাই দ্বিজেন্,

তোর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে, তোর নামে এই গল্পটি উৎসর্গ কর্‌ছি, তা ভাবিস্ নি। শুনেছি তুই লোকের কাছে আমার গল্পের খুব গর্ব্ব করিস্, অথচ আমার বিশ্বাস তুই আমার একটা গল্পও পড়িস্ নি। সেই বিশ্বাসে এই বই-খানা অপর বন্ধুদের না দিয়ে তোকে উৎসর্গ কর্‌বার ব্যবস্থা করেছি। এবার দেখি তুই কেমন না পড়ে থাক্‌তে পারিস্।

তোর

কেশব

বিবাহ-বিপ্লব

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিঃ এম্ সেন

বোধ হয়, চেষ্টা করিলে পুলিস-বিভাগে পুনরায় কার্য্য পাইতাম। তিন বৎসর পুলিসে দারোগাগিরি করিয়া কিন্তু পুলিস-বিভাগের উপর তেমন একটা মমতা জন্মায় নাই। সুতরাং সামান্য কারণে কর্ম্মচ্যুত হইয়া সে কর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মায় নাই।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—এ একটা মামুলি কথা। সময় অপেক্ষা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু মানবদেহের জঠর নামক অঙ্গবিশেষটি সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে অদ্যাবধি ধৈর্য্য নামক সদ্‌গুণের আধার বলিয়া কখনও প্রশংসিত হয় নাই। পোড়া পেটের জন্য একটা করিতে হইবে—এ প্রশ্নটা দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করিয়া আমার মানসপটে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল। কেরাণী-গিরি সংগ্রহ করা ভীষণ সমস্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে গেলে মূলধনের প্রয়োজন, ডাক্তারি বা ওকালতী পেশায় ইউনিভারসিটির চাপরাস, সৌভাগ্য প্রভৃতি নানারূপ অসম্ভব সামগ্রী আবশ্যক। আমার এক বাল্যবন্ধু নরেশচন্দ্র পশ্চিমে কার্য্য করিত। সেও পশ্চিম হইতে নামকাটা

সিপাহী হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল। উভয়ে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলাম,—কি উপায়ে পরের তোষামোদ না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। নরেশ বলিল—বাস্তবিক ভাই দেখ্‌ছি মরণ হ'লে পুনর্জ্জন্ম হয়, কিন্তু চাকরি গেলে আর চাকরি হয় না। আমি বলিলাম—আর ভাই, চাকরির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর্‌ছি না। বরং না খেয়ে মারা গিয়ে আবার পুনর্জ্জন্মের চেষ্টা কর্‌ব। উভয়ে খুব হাসিলাম। কসাইয়ের দোকান, মড়ার খাটের ব্যবসা, বিলাতী মতে ধোবীখানা, মুরগীর চাষ, পরিত্যক্ত টিনের কানেস্তারা ও নিলামী মাল খরিদ বিক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবসার বিষয় আলোচনা করিলাম, কিন্তু প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা আপত্তি বিরাট আকার ধারণ করিয়া বসিল। নরেশ বলে—আমি তো বদ্যি। শেষে না হয় কোথাও পাড়াগাঁয়ে গিয়ে নাড়ীটেপার ব্যবসা ধর্‌ব! আজকাল তো বদ্যির ঘরের মূর্খ ছেলেরাই কবিরাজ হয়। আমি বলিলাম—আর আমি একটা শিবমূর্ত্তি স্থাপন ক'রে পূজারি সেজে বসি, বামুনের ছেলের পক্ষে বৃত্তিটা মন্দ হ'বে না।

এই শিবমূর্ত্তি কলেজ ষ্ট্রীটের ধারে হইলে অধিক উপার্জ্জন হইবে, না আদালতের ধারে হইলে বেশী লাভের সম্ভাবনা, সে কথা লইয়া বাদানুবাদ চলিল। শেষে ঠিক হইল ধর্ম্মের নামে জুয়াচুরি করা অবিধেয় এবং পেটের দায়ে চিকিৎসক সাজিয়া মানুষ মারাও মহাপাপ।

নরেশ বলিল—না, ও সব কথা ঠিক না। তুমি তিন বছর

পুলিসে কাজ ক'রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমিও সওদাগরী আফিসে কাজ ক'রে কতকটা কাজ শিখেছি; সে শিক্ষারও সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। নরেশের কথায় আমার মনে একটা নূতন চিন্তার উদয় হইল। বাস্তবিক আমার পুলিসের অভিজ্ঞতাটা কি কোনও প্রকারে অর্থকরী বৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে না? আমাদের দেশে পুলিসের হস্তে যেরূপ বহুবিধ কার্য্যভার ন্যস্ত, তাহাতে তাহাদের দ্বারা কোনও জটিল মামলার তদন্ত হওয়া অসম্ভব। বিলাতে বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভের ব্যবসা বেশ সাধারণের হিতকর অথচ অর্থকরী। এ দেশে সে ব্যবসায় কেন সফলতা লাভ করিবে না? নরেশের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, আমরা উভয়ে একটা বে-সরকারী গোয়েন্দার ব্যবসা খুলিব! আমার বাল্যসহচর নরেশচন্দ্রকে অংশীদার করিয়া লইবার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভাবিলাম যদি আমি স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ সাজিয়া বসি, তাহা হইলে সকলেই আমাকে চিনিয়া ফেলিবে। যদি চোর জুয়াচোর জালিয়াৎ প্রভৃতি আমাকে দেখিবামাত্র সাবধান হইয়া যায়, তাহা হইলে পদে পদে আমাদের কর্ম্মে বিফলমনোরথ হইতে হইবে। সরকারী পুলিস এই কারণেই অনেক সময় চতুর অপরাধীর সন্ধান করিতে পারে না। পুলিস যেমন অপরাধীদিগের উপর গোয়েন্দাগিরি করে, সন্দেহচিত্ত অপরাধিগণও তেমনি তাহাদিগের চিরশত্রু পুলিসের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আপনাদের আত্মরক্ষার বিধান করে।

আমি বলিলাম—নরেশ, তুমি ডিটেক্‌টিভ সাজিয়া শিখণ্ডী হ'য়ে বস্‌বে, আমি তোমার আড়াল থেকে বাণক্ষেপ ক'রে কাজ ফতে কর্‌ব। নরেশ বলিল—আপত্তি নেই। আমি ডাক্তারখানার জানালার ধারের মোট সাজান বোতল হ'য়ে বস্‌ব এখন। 'শুভস্য শীঘ্রম্' ভাবিয়া সাতদিনের মধ্যে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটি অফিস খুলিয়া সাইন বোর্ড মারিলাম—

Mr. N. C. Sen.

Private Detective.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্ম-প্রশংসা

ভেক না হইলে ভিক্ষা মিলে না। একটা কোনও প্রকার স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে গেলে কতকটা বাহ্যিক আড়ম্বর অত্যাবশ্যক; তাহা না হইলে, প্রথম প্রথম পসার জমান কঠিন। সুতরাং নেহাৎ সেই মামুলি একটা আমকাঠের তক্তপোষ, দুইটি মলিন জীর্ণদেহ তাকিয়া সম্বল করিয়া আফিস না খুলিয়া একটু আধুনিক ধরণে টেবিল চেয়ার দিয়া গৃহ সজ্জিত করিয়া আফিস খুলিয়াছিলাম। সমস্ত আস্‌বাব সরঞ্জমগুলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবারও সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। অবশ্য এরূপ ভাবে গৃহসজ্জা করিতে প্রথমতঃ একটু মূলধন আবশ্যক

হইয়াছিল, কিন্তু ফলে আমাদিগের কর্ম্মস্থল বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। আমরা যে বাটীতে আফিস খুলিয়াছিলাম, তাহার প্রধান দরজা ছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে। সেই দরজাটিতে প্রবেশ করিলেই মক্কেল আমাদিগের আফিস ঘরে আসিতে পারিত। এ বাটীর পশ্চাতে গলির পথে একটি ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার ছিল। আমরা দ্বিতলের গৃহগুলিতে সেই পথে যাতায়াত করিতাম। নরেশ স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ সাজিয়া বাহিরে আফিসঘরে আমাদিগের সাহায্যপ্রার্থী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং আমরা তাহার অন্তরালে থাকিয়া ভিতরের গৃহ হইতে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতাম। আমাদের প্রধান মন্ত্রণাগৃহ ছিল দ্বিতলের ঘরে; আমরা দুইজন এবং আমাদিগের একটি সহকারী ডিটেক্‌টিভ রাখালচন্দ্র ব্যতীত কেহ সে কক্ষে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। রাখালের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও "ষট্‌কর্ণৈঃ ভিদ্যতে মন্ত্রঃ" এই নীতি অনুসরণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সকল যুক্তি-মন্ত্রণার মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতাম না। আমাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য কোনও ব্যক্তি আসিলে প্রথমে তাহাকে নরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। নরেশের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে তবে প্রয়োজনমত আমি নরেশের সেই অফিস-গৃহে তাহার নিকট পরিচিত হইতাম। এই রুদ্ধদ্বার গৃহে যখন একজন মক্কেল নরেশের সহিত মন্ত্রণা করিত, তখন অপর সকলকে বারান্দায় দুইখানি বেঞ্চের উপর অপেক্ষা করিতে হইত। আমাদিগের এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত

করিবার বিশেষ একটি কারণ ছিল। আমাদিগের দেশে উকিল বাবুরা প্রায়ই পাঁচ সাতটি মোকদ্দমার ভিন্ন ভিন্ন লোক একত্র লইয়া একস্থানে বসিয়া পরামর্শ করেন। অনেক সময় বিপক্ষ পক্ষ কি পরামর্শ করিতেছে তাহা জানিবার জন্য চতুর প্রতিযোগী মক্কেল সাজাইয়া নিজ পক্ষের লোককে বিপক্ষের উকিলের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং তাহাদিগের মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিপক্ষ দল কিরূপ যুক্তিমন্ত্রণা করিতেছে তাহা কৌশলক্রমে অবগত হইয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লয়। এইজন্যই আমাদিগের অফিসের নিয়ম-অনুসারে এক কালে এক জনের অধিক মক্কেল মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। সমস্ত দিবসের কর্ত্তব্য সারিয়া এক দিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুই জনে অফিসগৃহে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম; বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল; আমরা উভয়ে চা পান করিতেছিলাম। আষাঢ়ের জলধারার অত্যাচারে সদা-জনমানবপরিপূর্ণ, নিত্যকোলাহলময় কলিকাতার রাজপথগুলি এক প্রকার জনহীন হইয়াছিল; কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ জলময়; কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক খানা গাড়ীর শব্দ করিতে করিতে অতিশয় মন্থরগতিতে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া গমনাগমন করিতেছিল। হস্তস্থিত চায়ের পাত্রটি টেবিলের উপর রাখিয়া নরেশ সেন বলিল, সতীশ, তুমি ভাই বেশ ব্যবসা খুলেছ। এই সামান্য ছয় মাসের মধ্যে আমাদের নামটা বেশ জাহির হয়েছে,এমন কি ট্রামগাড়ীতে পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যকলাপ লোকের প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত হয়েছে। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রকম?

"সেদিন আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্যামবাজারের ট্রামে অফিসের দিকে আসিতেছিলাম। ট্রামখানি কর্ম্মস্থল হইতে গৃহপ্রত্যাগমন-প্রয়াসী যাত্রীতে পূর্ণ। একজন ভদ্রলোকের কিছু টাকা চুরি গিয়াছিল, তিনি নিজের দুঃখের কথা অপর একজন সহযাত্রীকে বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, 'আপনি কেন আপনার কেস্‌টি ডিটেক্‌টিভ এন, সেনের হস্তে অর্পণ করুন না'।"

নরেশের কথা শুনিয়া আমি একটু হাঁসিলাম! বলা বাহুল্য, একটু গর্ব্বিত হইলাম। নরেশ আবার বলিতে লাগিল,—"অমনি আমাদের কথা ট্রামের লোকদের মধ্যে প্রসঙ্গ হইয়া উঠিল।— বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না, যে সকল কেসের কথা আমরা কখন শুনিই নাই সেই সকল অপরাধ তদন্ত করিবার যশ আমা-দিগের ভাগ্যে পড়িল। আমি হাঁসিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বাজারে নাম হওয়া পেশাদার লোকের পক্ষে বাস্তবিকই হিতকর। আর ট্রামের গল্প ঐ প্রকারই হইয়া থাকে। গল্প করিয়া অপরকে পরাজিত করিবার বাসনাটা আমাদিগের জাতীয় বৃত্তি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। সুতরাং আমাদিগের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে লোক দু'একটি গল্পের সৃষ্টি করিয়া অপরকে বলিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তবে নিন্দা বা অপযশ না রটাইয়া লোকে যে আমাদিগের ফার্ম্ম সম্বন্ধে সুখ্যাতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির ইহাই একটি সোপান।"

নরেশ বলিল,—সেই পার্শেল চুরির কেস্‌টি তোমার স্মরণ

আছে ত? অবশ্য তুমি যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সহিত সে তদন্তটি সম্পন্ন করিয়াছিলে তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু সে কেস্‌টায় তোমার দক্ষতার কথা যদি ট্রামের আরোহীর নিকট শুনিতে ত তোমারও হাসি আসিত।”

বাহিরে প্রাবৃটের নীরদমালা নিদাঘ-সূর্য্যতাপক্লিষ্ট ধরণীর উপর সমভাবে বারিসিঞ্চন করিতেছিল। পথিপার্শ্বস্থিত দুই একটি গ্যাস-দীপ অতি ম্লানভাবে কর্ত্তব্যপালন করিতেছিল। পাইপের ভিতর জল প্রবেশ করায় কতকগুলা একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল। এরূপ দুর্য্যোগের দিনে কাজ-কর্ম্মের কোনও আশা ভরসা ছিল না; সুতরাং আমার অংশীদারের নিকট প্রশংসা শ্রবণ করিয়া আত্মাভিমান বাড়াইতেছিলাম। মুখে আলবোলার নল দিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া নরেশের গল্প শুনিতে লাগিলাম। তাহার মুখে পার্শেল চুরির কেসের উল্লেখ শুনিয়া একবার সে ব্যাপারের ঘটনাগুলা মনে মনে স্মরণ করিয়া লইলাম। তাহাদিগের চিরন্তন প্রথা-অনুসারে ভাগল-পুরের ভোতারাম বুধমল নামক ফারম একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে নগদ সাত সহস্র টাকা পূরিয়া রেলযোগে কলিকাতায় চালান দিয়াছিল। ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ঐ সকল মূল্যবান পার্শেলের রেলের রসিদ দুই পয়সার সাধারণ ডাকে কলিকাতার গদিতে পাঠাইয়া থাকে। ভোতারাম সূক্ষ্মবুদ্ধি-চালিত হইয়া এ ক্ষেত্রেও উক্তরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল। কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ জুয়াচোর-পুঙ্গব পোষ্ট

পিয়নের সাহচর্য্যে এই রসিদ হস্তগত করেন। তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি ভোতারাম বুধমল-প্রেরিত সেই বাক্সটি হাওড়ার রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে খালাস করিয়া লইয়া আত্মসাৎ করেন। আমি দশদিনের মধ্যে চোর ও পাঁচ সহস্র টাকা ধরিয়া দিয়াছিলাম। এই গল্পটি বাজারে কিরূপ আকার ধারণ করিয়া প্রচলিত হইতেছিল তাহা জানিবার জন্য একটু আগ্রহান্বিত হইয়া নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ গল্পটা ট্রামে কি রকম ভাবে চল্‌ছিল?"

নরেশ বলিল—ট্রামে শুনিলাম দুই সহস্র গিনি পূর্ণ একটি বাক্স বড়বাজারের একদল প্রসিদ্ধ জুয়াচোর জাল রেল রসিদ দেখাইয়া খালাস করিয়া লইয়া যায়। এ রহস্যের কেহ কিছু মীমাংসা করিতে পারে না, শেষে কেস্‌টা আমার হস্তে সমর্পিত হয়। আমি কেবল পায়ের দাগ ধরিয়া—মনে থাকে যেন ঘটনার একমাস পরে চোরের আড্ডায় পৌঁছি। সেই দস্যুদল তখন প্রেমারা খেলায় উন্মত্ত, আর ভোতারাম বুধমলের সেই ধনপূর্ণ অপহৃত বাক্সটা গৃহে পড়িয়াছিল। আমি শার্দ্দূল-বিক্রমে রোষ-কষায়িত নেত্রে দুই হস্তে দুইটি রিভল্‌ভার ধারণ করিয়া বেগে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম"—নরেশের কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম। স্মিতমুখে নরেশ বলিল—"আর হাসিও না, আমি ত লক্ষ্মণের মত মেঘনাদের যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলাম। দস্যুগুলা ছোরা ছুরি লাঠি সোটা বাহির করিল। আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। আমার আজ্ঞার অপেক্ষায়

সশস্ত্র সরকারী পুলিস বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া আমার সাঙ্কেতিক বাঁশরী ধ্বনি করিলাম, তখন সদলবলে সরকারী পুলিস গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়পক্ষে একটা বেশ গুরুতর রকমের মারপিট হইল, শেষে দুর্বৃত্তেরা ধৃত হইয়া শাস্তি ভোগ করিল।" আমরা উভয়ে খুব হাসিলাম। আমি বলিলাম—"কি জান সাধারণ লোকের দোষ নাই। এক শ্রেণীর দেশী ও বিলাতী ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস আছে যাহাতে লাঠী সোটা গুলি গোলা মারপিট প্রভৃতি যত কিছু অসম্ভব আজগুবি ব্যাপার সন্নিবেশিত থাকে। এ সকল লেখকই পাঠকদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দেয়। আমার বিশ্বাস, সেই সকল লেখক মামলা তদন্ত-সংক্রান্ত কোন কথাই বোঝেন না এবং সাধারণ পাঠকবর্গ একটু স্থির হইয়া বিচার করিয়া দেখে না যে, বাস্তব জগতে সে শ্রেণীর কার্য্য কয়টা সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং ট্রাম-গাড়ির যাত্রীদিগের মধ্যে মনোরঞ্জক দুই একটি আজগুবি গল্প জন্মিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে!" নরেশ বলিল—"বাস্তবিক তোমার তদন্তের প্রথা বড় চমৎকার। কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রতি পদে হিসাব করিয়া চলিলে অতি সত্বরে এবং প্রকৃত সাফল্যের সহিত সত্যে পৌছান যায়। কিন্তু—"

ঠিক সেই সময় আমাদিগের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটি ভদ্রলোক সত্বরই আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আমরা পূর্ব্বেই অশ্বপদ-বিক্ষিপ্ত জলের শব্দ পাইয়াছিলাম,

কিন্তু এরূপ দুর্য্যোগের দিনে সেই গাড়িখানি যে আমাদিগেরই কার্য্যস্থলে যাত্রী লইয়া আসিবে, সে সন্দেহ আমাদিগের মনে মুহূর্ত্তের জন্য উপস্থিত হয় নাই। আমাদিগের আদেশমত ভৃত্য বাহিরে ভদ্রলোকটি ডাকিতে গেলে নরেশ বলিল—"আর কেন? পেচকবৃত্তি অবলম্বন কর, কক্ষান্তরে যাও।" আমি বলিলাম,—"এমন দিনে যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারে তাহার প্রয়োজন যে নিতান্ত গুরুতর, সে বিষয়ে মতভেদ নাই। এরূপ লোককে প্রথম হইতে নির্ভীকচিত্তে বিশ্বাস করিতে পারা যায়। আমি স্বয়ং ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচার-শক্তি

আমার কথা শেষ হইবামাত্র ভদ্রলোকটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে, দেখিতে বেশ সুশ্রী এবং আকৃতি দেখিলে বেশ সবলকায় ও শ্রমসহিষ্ণু বলিয়া বোধ হয়। মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, লোকটি বহুদর্শী এবং জগতের রঙ্গমঞ্চে নিজের অদৃষ্ট-সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়াছে। মিঃ সেন গম্ভীরভাবে চুরুট টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি চান? অতি কাতর অথচ ব্যগ্রভাবে ভদ্রলোকটি বলিলেন—মহাশয়ের নাম কি

মিঃ সেন ? বড় বিপদে পড়েই আপনার সাহায্য ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি। নরেশ বলিল—অবশ্য সহজেই তাহা অনুমান করা যায়, তা না হ'লে আর এত দুর্য্যোগে মশায় আমার গৃহে পদার্পণ করবেন কেন ? আমি তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী এইরূপ বাহ্যিক ভাব দেখাইয়া একখানা সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভদ্রলোকটি আমার প্রতি অতি কোমল কটাক্ষপাত করিয়া নরেশচন্দ্রকে বলিলেন,—আমার ব্যাপারটা খুব গোপনীয়, যদি কেহ ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পারে, তা হ'লে বিশেষ ক্ষতি হ'বে।"

আগন্তুকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নরেশচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল—"আপনি এঁর কাছে কোন কথা গোপন কর্‌বেন না, উনি আমার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। সম্ভবতঃ আপনার কাজ উনিই কর্‌বেন। আপনার বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'বার কারণ নেই।" ভদ্রলোকটি সাগ্রহে বলিলেন—"আচ্ছা উনি যদি আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হন, তা হ'লে ওঁর নিকট আমি কোনও কথা গোপন করব না। কিন্তু আমার কাজটি অত্যন্ত গুরুতর। তার ফলাফলের উপর আমার সমস্ত মানসম্ভ্রম নির্ভর করছে। আমার কাজটি আপনি স্বয়ং হাতে না নিলে কোনও ফল হ'বে না।" নরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"সেজন্য আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমরা মনে মনে বুঝে ব্যবস্থা করব।" ভদ্রলোকটি পূর্ব্ববৎ উৎসুক ভাবে কহিলেন—"আমি আপনার প্রশংসা শুনে আপনার কাছে এসেছি। আমি অর্থের মায়া করি না ; আপনি যত অর্থ চান

আমি দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি, কিন্তু আমার কাজটি আপনার নিজের দ্বারা হওয়া চাই।” নরেশ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া দিল যে আমাদিগের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও রূপ চিন্তিত হইতে হইবে না, যাহার দ্বারা সে কার্য্যটুকু সম্পাদিত হইলে তাঁহার অধিক ইষ্ট হইবে, আমরা তাহারই আয়োজন করিব। বুঝিলাম, ভদ্রলোকটি এ কথায় তেমন আশ্বস্ত হইলেন না। তিনি যে আমাকে একটা অপদার্থ বুঝিয়া আমার সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম না। কিন্তু যাহাতে আমার উপর তাঁহার একটু বিশ্বাস জন্মে তাহার চেষ্টা করিলাম। প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয়ের নাম?

“শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।” আমি বলিলাম—মহাশয়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া, নয়? তিনি বলিলেন—হ্যাঁ। আমি।—বাঁকুড়ায় আজকাল খুব অল্পই থাকা হয়। সুরেন্দ্র।—হ্যাঁ, দেশ এক রকম ছেড়েছি। আমি।—মহাশয়কে দেখ্‌ছি খুব রোদে ঘুরতে হয়। অবশ্য ইংরাজি পোষাক ব্যবহার করেন, আর দিনের বেলায় রোদে ঘোরবার সময় নীল চসমা চোখে দেন। ঝলসান সূর্য্যকিরণ থেকে চোখকে শীতল রাখবার এটা বেশ উপায়। এবার সুরেন্দ্র বাবু একটু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নিজের গুরুতর বিষয়টি ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া আমাকে কৌতূহলাক্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়ের নাম? আমাকে আপনি দেখিলেন কোথায়? আমি ত মহাশয়কে চিনি

বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। আমি যেন তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলাম না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলাম,—মহাশয় সিগারেট পান করেন, পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছেন। নরেশ হাসিয়া বলিল,—দেখিলেন সুরেন্দ্রবাবু! আমার কর্ম্মচারীর কৃতিত্ব-সম্বন্ধে আপনি সন্দেহ করিতেছিলেন, কিন্তু ইনি আপনাকে একবার দেখিবামাত্র আপনার সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিয়া দিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—মহাশয় কি প্রকৃতই আমাকে জানেন না? আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি আপনার সম্বন্ধে যে দু' একটি কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক কোনও কথাই নাই। আপনাকে একটু বিশেষ ভাবে দুই এক মুহূর্ত্ত লক্ষ্য করিলে সকল লোকেই ঐরূপ কথা বলিতে পারে। অবশ্য মানুষের প্রকৃতি অধ্যয়ন করা আমাদের পেশা বলিয়া আমরা যেরূপ ভাবে মনুষ্যের স্বভাব ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করি, সেরূপ সাধারণ লোকে করে না। আর এইরূপে মানুষ অধ্যয়ন করিলে তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ দুই চারিটি কথা সকলেই বলিতে পারে। বিস্মিত সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার জন্মস্থান সম্বন্ধে ঠিক ধারণাটা আপনি কি প্রকারে করিলেন? আমি বলিলাম—বিশাল বাঙ্গালা দেশের সকল অধিবাসীই বাঙ্গালা কথা কহিয়া থাকে তাহা সত্য, কিন্তু প্রত্যেক জেলার উচ্চারণের একটা বিশেষত্ব আছে। কতকগুলা বিশেষ শব্দব্যবহারেও একটি প্রাদেশিকতা লক্ষিত হয়। আমি বাল্যাবধি প্রত্যেক

জেলার অধিবাসীর উচ্চারণের বিভিন্নতা অধ্যয়ন করিতাম। সেই বিদ্যার বলে আজ জোর করিয়া মহাশয়কে বলিলাম যে, মহাশয়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলায়। সুরেন্দ্রবাবু আমার কৈফিয়তের পর বিষয়টা অত্যন্ত সাধারণ ভাবিয়া সেই শোকক্লিষ্ট মুখে একটু হাসিয়া লইলেন। তাহার পর একবার আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন।

নরেশ বলিল,--অবশ্য আপনার উচ্চারণে বাঁকুড়া জেলার টানটা অতি অল্প। সাধারণ লোকের লক্ষ্য না করিবারই কথা। আর আপনার কথাবার্ত্তায় বাঁকুড়া অঞ্চলে চলিত শব্দের এত অভাব বলিয়াই আমার কর্ম্মচারী সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে, মহাশয়ের বহুদিন হইতে জন্মস্থান পরিত্যাগ করা হইয়াছে।"

নরেশচন্দ্রের এইরূপ বিজ্ঞ কথায় আমি তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। সে যে আমার প্রণালীতে কার্য্য কারণের সম্বন্ধ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সকল বিষয় বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা অতীব সুখের বলিয়া বোধ হইল। এ বিষয়ে নরেশের উন্নতির উপর আমাদের কারবারের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করিতেছে তাহা বলা বাহুল্য।

সুরেন্দ্রবাবুকে বুঝাইবার জন্য বলিলাম,—"আপনি যে রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়ান তাহার প্রমাণ আপনার গায়ের চামড়া। আপনার হাত বা মুখের রং অপেক্ষা আপনার দেহের অন্য অবয়বের বর্ণ উজ্জ্বল। ইহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আপনার হাত ও মুখের যেরূপ বর্ণ আপনার শরীরের সাধারণ বর্ণ সেরূপ

নহে। আপনার দেহের যে সকল স্থল আবৃত থাকে, সে সকল স্থলে আপনার স্বাভাবিক বর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আপনার মুখ বা হাতের রং বিকৃত করিবার প্রধান কারণ রৌদ্রের তাপ। এই দুই স্থল আবৃত থাকে না বলিয়া সূর্য্য কিরণ এই দুই স্থল দগ্ধ করিতে পারে। আবার আপনার মুখে অপরাপর স্থল অপেক্ষা আপনার কপালের উপরের অংশটি উজ্জ্বল বর্ণের। অর্থাৎ সাধারণতঃ লোকে হ্যাট পরিলে যে অংশটি টুপিতে আবদ্ধ থাকে আপনার সেই অংশের বর্ণ সূর্য্যপক্ক নহে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, আপনি হ্যাট ব্যবহার করেন। মহাশয় যখন পাগল নন, তখন হ্যাটের সহিত নিশ্চয়ই পেণ্টুলেন ব্যবহার করেন। তাই বলিয়াছিলাম, মহাশয় ইংরাজী পোষাক পরিয়া রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়ান।"

আগন্তুক আমাদিগের বিচারশক্তি দেখিয়া মনে মনে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছিলেন বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা মশায়, এখনত বোধ হ'চ্চে এ সিদ্ধান্তগুলার ভিত্তি আছে; কিন্তু নীল চশমা চোখে দিই এ কথাটা কেমন করে বললেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"এ কথাটাও জ্যোতিষ বিদ্যার বলে বলি নাই। এ সিদ্ধান্তেরও ঐ প্রকারের বেশ সরল ভিত্তি আছে। আপনার নাকের উপর দাগ দেখিয়া ধরিতে পারা যায় যে, আপনি চশমা ব্যবহার করেন। লোকের চোখের পীড়া সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়। অনেকে নিকটের পদার্থ দেখিতে পায় না,

আর অনেকে দূরস্থ জিনিষ দেখিতে পায় না। মহাশয় চেয়ারে বসিবার পূর্ব্বে আমাদের ঘরে ঐ দূরের দেওয়ালের ছবিখানির তলায় কি লেখা আছে তাহা অন্যমনস্কভাবে পড়িয়া লইলেন। তাহাতে আপনার দৃষ্টিহীনতার কিছু পরিচয় পাইলাম না! একবার অন্যমনস্কভাবে 'বেঙ্গলি' কাগজখানা তুলিয়া তারিখটা দেখিয়া লইলেন, তাহাতেও কোনও প্রকার ভ্রূকুঞ্চন করিলেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আপনি রৌদ্রে ঘুরেন, সুতরাং আপনার পক্ষে নীল চশমা ব্যবহার করাই স্বাভাবিক।"

আমার কথা শুনিয়া নরেশ ও সুরেন্দ্রবাবু একটু হাসিলেন। আমার উপর সুরেন্দ্র বাবুর একটু বিশ্বাস জন্মিল বলিয়া বোধ হইল। নরেশ বলিল,—"আপনি সিগারেট্ পান করেন এ কথাটা প্রত্যেক স্কুলের ছেলেই বলিতে পারিবে। কারণ আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে বেশ দাগ রহিয়াছে। আর মহাশয় পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছেন, এ কথা বলিবার বিদ্যাটা আপনাকে শিখাইয়া নিজেদের অন্ন মারি, এটা বোধ হয় আপনার অভিপ্রেত নয়।"

সুরেন্দ্র বাবু আমাদের কথাবার্ত্তায় একটু হাসিয়াই আবার পূর্ব্ববৎ গম্ভীর হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সেই অজানা শোকের কারণটা মাথা তুলিয়া আবার তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ আকুল করিল। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"অবশ্য মহাশয়দের উভয়েরই অত্যন্ত পারদর্শিতা আছে তাহা বুঝিয়াছি। আপনারা উভয়েই আমাকে এই গভীর বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আপনারা আমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বালিকা-হরণ

আমি তাঁহাকে যথাশক্তি সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার মামলাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলাম। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে যে, হৃদয় ভারাক্রান্ত হইলে মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। কথাটা সত্য; কিন্তু ভারাক্রান্ত হৃদয়ের উৎস একবার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে আরম্ভ করিলে তাহা বেগবতী নদীর মত সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমাদিগের নূতন মক্কেলটির শোককাহিনীও সেইরূপ দুইঘণ্টা কাল ধরিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিল। নিষ্প্রয়োজন শাখা-পল্লবাদি ছাঁটিয়া ফেলিলে তাঁহার আখ্যায়িকাটা এইরূপ দাঁড়ায়—

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী যশোহর সহরে সুরেন্দ্রবাবু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ারের কার্য্য করিতেন। সহরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গালায় তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। তাঁহার কন্যাটির বয়স আন্দাজ ত্রয়োদশ বৎসর এবং তাঁহার একমাত্র পুত্রটি দশম-বর্ষীয়। পূর্ব্বে পশ্চিমভারতে নানাস্থলে কর্ম্ম করিয়া তিনি দেড় বৎসরাবধি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুর কন্যাটির নাম মৃরলা। শুনিলাম, কন্যাটি দেখিতে বড়ই সুশ্রী। কুলীন সুরেন্দ্রনাথের এই কষিত-কাঞ্চনবরণা তনয়ার রূপে আকৃষ্ট হইয়া শাহপুরের জমিদার

শীতলপ্রসাদ ঘোষাল তাহাকে পুত্রবধূ করিতে মনস্থ করেন। এরূপ সম্বন্ধ সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বাবধি এ প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয়েরা ঘোষালের গৃহে কন্যা সম্প্রদান করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হন। শীতলপ্রসাদও এই সর্ব্বসুলক্ষণ-বিশিষ্টা কন্যাটিকে নিজ পুত্রবধূ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হন। শেষে অর্থের লোভে সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয়েরা ঘোষাল-গৃহে মুরলার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যে দিন চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে আমাদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ আমাদের আফিসে আসিয়া আমাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন, ঠিক সেই দিন হইতে একমাস পরে মুরলার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। নববধূর উপযুক্ত অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ জন্য তিনি চারি সহস্র মুদ্রা অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের জন্য সকল আয়োজনই হইতেছিল, কিন্তু গত কল্য প্রভাতে সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যাটি অপহৃত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস কোনও দুষ্ট লোক তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার জন্য তাঁহার কন্যাটিকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

সুরেন্দ্র বাবুর গল্প শুনিয়া বুঝিলাম যে, স্নেহময়ী কন্যার শোক, শীতলপ্রসাদের অর্থের শোক এবং সামাজিক অবমাননার ভয় প্রভৃতি নানা ভাব একত্র হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছে। তাঁহার আবেগপূর্ণ কাতর কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমাদেরও হৃদয় আর্দ্র হইল। নরেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা এ বিষয়টি আপনি কি পুলিসের হস্তে সমর্পণ করেন নাই ?

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—পুলিসে এ সংবাদ প্রদান করিলে আমাকে একবারে পথে বসিতে হইবে। পুলিসে এ সংবাদ দিলে দেশশুদ্ধ সকলেই এ কথা জানিতে পারিবে। আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং আমার ভাবী বৈবাহিক শীতলপ্রসাদ বাবু এ খবর জানিতে পারিলে আমার পক্ষে কিরূপ অশুভ হইবে, তাহা ত সহজে অনুমান করিতে পারিতেছেন।

আমি বলিলাম,—হাঁ, শীতলপ্রসাদ জানিতে পারিলে ব্যাপারটা বড় গুরুতর হইয়া উঠিবে। ভবিষ্যতে যদি বাস্তবিকই কন্যাটীর উদ্ধার হয়, তাহা হইলে শীতলপ্রসাদ বাবুর পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হওয়া একেবারে অসম্ভব হইবে। আর আমাদের দেশের কু লোকে এরূপ একটা কুৎসা করিবার বিষয় পাইলে সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষে ত দেশে বাস করা দায় হইয়া উঠিবে।

আমার কথায় তাঁহার হৃদয়ের ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—সতীশ বাবু, আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন। এই কারণেই আমি আমার কন্যার অদৃশ্য হওয়ার কথা এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলি নাই। আমার ইচ্ছা গোপনে কন্যা অনুসন্ধান করিয়া যে কোনও প্রকারেই হউক, এই মাসের ভিতর তাহাকে উদ্ধার করিব। আর নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাকে ঘোষাল-পুত্রের হস্তে দিয়া সকল দিক্ বজায় রাখিব। আপাততঃ মুরলার অদৃশ্য হইবার কথা, এমন কি শীতলপ্রসাদ বাবুকেও বলিব না।

সুরেন্দ্রনাথের বিবরণ শুনিয়া মনে বড় আতঙ্ক হইল। এই নূতন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পর্য্যন্ত অনেক রহস্যময় কাহিনী শুনিয়াছি!

অনেক প্রকারের দায়িত্ব শিরে লইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু এরূপ জটিল গভীর রহস্যময় অথচ এত বড় দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করি নাই। এ রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলে চিরদিনের জন্য একটা ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের যথেষ্ট ইষ্ট সাধিত হইবে। কিন্তু যদি এই সামান্য ত্রিশ দিনের মধ্যে এ রহস্যের মীমাংসা করিতে না পারি, যদি সুরেন্দ্র বাবুর কার্য্যটি হস্তে লইয়া শেষে একমাস পরে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিতে হয় যে, তাঁহার কোনও উপকার করিতে পারিলাম না, তাহা হইলে আর ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না। প্রথমে শুনিয়াই ত ব্যাপারটা বড় গুরুতর সমস্যাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। এমন কোন একটা ভিত্তি পাইলাম না, যাহার উপর আমাদিগের থিওরি স্থাপন করি। অপরাধী ধৃত হইতে যতই বিলম্ব হইবে বিপদ ততই বৃদ্ধি পাইবে। আর একমাসের মধ্যে অপহৃত কন্যার সন্ধান করিতে না পারিলে বিপদের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইবে। এই একমাসের পরেও কন্যাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে সাফল্যের অর্দ্ধেক আনন্দ বিফল হইবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া দুই বন্ধুতে আড়ালে গিয়া পরামর্শ করিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলাম,—মহাশয় আপনার কেস্ যেরূপ জটিল তাহাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন।

আমাদিগের কথা শুনিয়া তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিরাশার মর্ম্মস্পর্শী করুণস্বরে তিনি বলিলেন—আপনারা আমাকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলে আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে।

এ কেসটা আপনাদিগকে হাতে লইতেই হইবে। যদি আমার ভাগ্যদোষে আপনারা অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলেও আমি আপনাদিগের নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিব।

তাঁহার এইরূপ কাতর অনুরোধেও আমরা একটু ইতস্ততঃ করিলাম। শেষে নরেশ বলিল,—একবার কাজটা হাতে লইয়া দেখিতে ক্ষতি কি? তবে ভদ্রলোককে বলিয়া দেওয়া যাউক যে, আমাদিগের উপর তিনি যেন সম্পূর্ণ নির্ভর না করেন। আমরাও এ বিষয়ে তদন্ত করিব। আর তিনি ইচ্ছা করিলে এ কার্য্যের জন্য সরকারী বা বে-সরকারী অপর গোয়েন্দাকেও নিযুক্ত করিতে পারেন।

এ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া সুরেন্দ্র-বাবু কতক আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন,এ বিষয়ে তিনি আমাদিগের ব্যতীত অপর কাহারও সাহায্য লইতে পারিবেন না। আপাততঃ আমাদিগের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য তিনি দুইশত মুদ্রা প্রদান করিলেন; এবং কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে তিনি এক সহস্র মুদ্রা উপহার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

একশত টাকার দুইখানি নোট আমার টেবিলের উপর রাখিয়া ব্রাহ্মণ আমার দুইটী হাত ধরিলেন। তিনি বলিলেন—আপনারা ভদ্রলোক, আমার অবস্থাটি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; এ বিষয় আমি পুলিশের হস্তে দিতে পারিব না বা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না। তাহা না হইলে আপনাদিগকে এত অনুরোধ করিতাম না।

অগত্যা আমরা কন্যাচুরির মামলা হস্তে লইতে স্বীকৃত হইলাম।

প্রায় রাত্রি ১২টার সময় সুরেন্দ্র বাবু আমাদিগের গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। আমি নরেশকে বলিলাম,—আজকের সভা ভঙ্গ করিয়া চল, খাওয়া দাওয়া করা যাক।

আমাদিগের আফিসের উপরেই আমাদিগের বাসা। তখন বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু রাজপথ জনমানবহীন। ভৃত্যকে ডাকিয়া আফিস বন্ধ করিতে অনুমতি করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছি, এমন সময় দরজায় কে আঘাত করিল। ভৃত্য বাহিরে গিয়া সংবাদ আনিল, একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—এর চেয়ে ত পুলিশের কর্ম্ম ছিল ভাল। এই বৃষ্টি-বাদলের দিন রাত্রি ১১টার সময় আবার মক্কেল আসে কেন?

নরেশ বলিল,—ওহে মক্কেল লক্ষ্মী। বস, বস, কি বলে শুনে যাও। কে বলতে পারে যে আবার হাজার টাকা পাওয়া যাবে না?

আমি বলিলাম—না। সকল লোককে আমি পরিচয় দিতে চাহি না। তুমি স্বয়ং প্রথমে শুনে পরে আমাকে বোলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছ'তিন নয়

নূতন মক্কেলদের দেখা দিলাম না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে ছাড়িলাম না। কুলবধূ যেমন নিজে গবাক্ষান্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে বেশ উত্তমরূপে দেখিয়া লয়, আমিও তেমনি দরজার ছিদ্র দিয়া মক্কেলদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। একজন মারবাড়ী, অপরটি বাঙ্গালী। উভয়েই মূর্ত্তিমান—এক ভস্ম আর ছার। উভয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলা যোগ করিয়া, সমভাবে ভাগ করিয়া লইলে দুইটি বেশ সুপুরুষ নির্ম্মিত করিতে পারা যাইত। বিধাতা সেরূপ কার্য্য কেন করেন নাই তাহা অন্তর্য্যামী মধুসূদন জানেন। বাঙ্গালীটি উচ্চে প্রায় ছয় ফুট! মারবাড়ীটি নাগরা জুতা লইয়া পাঁচফুটেরও দুই এক ইঞ্চি কম হইবে। মারবাড়ীটি খুব শ্বেতবর্ণ—ধবলকায়, আর বাঙ্গালীটি কৃষ্ণবর্ণের। বাঙ্গালীর নাসিকা খুব লম্বা, মারবাড়ীর নাসিকা সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র। উভয়েরই চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

নরেশচন্দ্র বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া মারবাড়ীটির নাম জিজ্ঞাসা করিল। আগন্তুক বাঙ্গালায় বলিল—"আমার নাম সুমের মল। আমি দয়েহাটার মেঘরাজ সুমের মল ফারমের অংশীদার।"

নরেশ বাঙ্গালীটির দিকে চাহিল। সে বলিল—"আমার নাম শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ। আমি এঁদের কর্ম্মচারী।"

কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন জানিয়া হাসি আসিল। সুবোধের নিজের তো কথাই নাই, তাহার তিন পুরুষের মধ্যে কেহ সুবোধ ছিল কি না তাহা বলা কঠিন। এরূপ দুর্ব্বোধ কুটিল লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। সুবোধ ইচ্ছা করিলে নরহত্যা এমন কি পিতৃ-হত্যা করিয়া পরক্ষণেই চটাই দাস বাবাজীর আখরায় গিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া 'তা ধিয়া তা খিয়া' করিয়া নাচিতে পারে, বা গড়ের মাঠে গিয়া ধীরভাবে ক্রিকেট খেলিতে পারে। তাহার মুখের ভাবের কিছু বিকৃতি হইবে না। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া আদৌ বোধ হইল না যে, সে সুমের মলের কর্ম্মচারী।

নরেশ বলিল,—আপনাদের এত রাত্রে কি প্রয়োজন? অবশ্য খুব জরুরি কাজ না থাকলে—

তাহার কথায় বাধা দিয়া সুবোধ বলিল—আজ্ঞে হাঁ৷ আমাদের বড় বিপদ। আমরা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার দায়ে পড়েছি।

আমি খুব সাগ্রহে তাহাদের কথা শুনিলাম। নরেশও একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইল। সুবোধ বলিল—মেঘরাজ সুমের মলের রোকড়ের কারবার, বিবেচনা করুন হুণ্ডি, কেনা বেচা, টাকার লেন দেন, একরকম বিবেচনা করুন ব্যাঙ্কিং কারবার।

নরেশচন্দ্র স্থির হইয়া "বিবেচনা" করিল। সুবোধ বলিল,—আমাদের লাহোরের গদির মনিব বিবেচনা করুন হুক্কার মল। তিনি টেলিগ্রাফ করেছেন যে বিবেচনা করুন—

নরেশ বলিল,—কই দেখি, তিনি কি টেলিগ্রাফ করেছেন

সুবোধ তাহার পকেটগুলি একে একে তল্লাস করিল, টেলিগ্রাফ পাইল না। শেষে সুমের মলকে তাহার পকেট দেখিতে বলিল। সুমের মল তাহার মেরজায়ের পকেট, কাপড়ের ট্যাঁক, এমন কি কাঁচার প্রান্ত অবধি দেখিল, টেলিগ্রাফ পাওয়া গেল না। কাগজ খুঁজিবার সময় সুমের মল তাহার রক্তহীন সাদা মুখখানা নানারূপে বিকৃত করিল, ঘন ঘন ছারপোকার দংশনে মানুষ যেমন ছটফট্ করে, সেই রকম ছটফট্ করিল, কিন্তু সুবোধচন্দ্রের সেই এক রকম মুখভাব।

সুবোধ বলিল,—যাক্। কাগজখানা বিবেচনা করুন বাড়ীতে ফেলে এসেছি। সংবাদের মদ্দা কথাটা হ'চ্চে এই যে পরশু রাত্রে আমাদের লাহোরের গদি থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা চুরি গেছে।

টাকার শোকে সুমের মল শিরে করাঘাত করিল। সুবোধের সেই এক ভাব। সুমের মল বলিল,—বাবু, উদ্ধার করুন। আপনাদের নাম শুনে এসেছি, উদ্ধার করুন।

দেখিলাম নরেশ একটু সঙ্কটাপন্ন হইল। আমিও একটু চিন্তিত হইলাম। অবশ্য সে সময় আমাদের হস্তে সেরূপ কোনও জরুরি তদন্ত ছিল না। যদি ইহারা কিছু পুর্ব্বে আসিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই লাহোরে যাত্রা করিতাম। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর গুরুতর কার্য্যটির ভার লইয়া আমরা সুমের মলের চুরির তদন্ত করিতে কিছুতেই প্রবৃত্ত হইতে পারি না। নরেশও স্থির হইয়া এই সকল কথাগুলা ভাবিয়া লইল। সুমের মল আগ্রহে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল।

তাহাকে স্থির থাকিতে দেখিয়া সুবোধ বলিল,—বিবেচনা করুন কালকের রাত্রের মেলে ছাড়লে, বিবেচনা করুন—

নরেশ বলিল,—বিবেচনা সবই করছি, এখন আমার পক্ষে কলিকাতা ছাড়া অসম্ভব। যদি দুঘণ্টা আগে আস্‌তেন—

সুমের মল বলিল—না মহাশয়, এ কাজ আপনাকে নিশ্চয়ই কর্‌তে হ'বে। যদি অপর কাজ নিয়ে থাকেন তো ছেড়ে দিন। আমার টাকা উদ্ধার করতে পারলে নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার টাকা বক্‌শিস্ দিব।

নরেশ বলিল,—তা'ত বুঝলুম, কিন্তু একটু পূর্ব্বে—

সুবোধ বাধা দিয়া বলিল—ঐ লোকটি বেরিয়ে গেল, বিবেচনা করুন, তার কোনও মামলা বুঝি আপনি নিয়েছেন? তা তাঁর টাকা বিবেচনা করুন ফেরত দিন।

নরেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—না, হ্যাঁ, ওর কিছু মামলা নেই।

সুমের মল সুবোধের দিকে চাহিল। সুবোধ বলিল,—না উনি বেরোবার সময় আমাদের বলছিলেন যে ওঁর একটা গুরুতর মামলা আছে?

নরেশ বলিল—হ্যাঁ ওঁর জন্যই যেতে পারবো না।

সুমের মল সুবোধের মুখের দিকে চাহিল, শিরে করাঘাত করিল, হাতজোড় করিয়া বলিল—মশায় আমার কেস্‌টি নিন।

সুবোধও হাতজোড় করিল। তাহার লম্বা নাসিকার জন্য তাহাকে চিত্রের গরুড় পক্ষীর মত দেখিতে হইল। নরেশ

সম্মত হইল না। তাহারা আবার পরদিন সন্ধ্যার সময় আসিবে বলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে আমি নরেশের প্রতি একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম। অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার বিচক্ষণতার অভাবে। সুবোধ লোকটার উপর কেমন একটা সন্দেহ হইতেছিল। আমার বোধ হইল, সে জানিতে আসিয়াছিল যে আমরা সুরেন্দ্র বাবুর কন্যাচুরির মামলার ভার লইয়াছি কি না! আমার মনে হইতেছিল যে, সে আপাততঃ নরেশকে কলিকাতার বাহিরে পাঠাইয়া বালিকা চুরি মামলা বন্ধ রাখিতে চাহে।

আমার কথা শুনিয়া নরেশ হাসিল। সে বলিল,—তুমি একটু বেশী সাবধান। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।

উভয়ে তর্ক করিলাম। কিছু স্থির হইল না। নরেশ হাসিয়া বলিল—এস পাশা চালি। যদি হাত খোলার দান পড়ে, বুঝবো তোমার জিত,—সুবোধ মেয়ে-চুরি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট।

হাসিয়া পাশা চালিলাম। দান পড়িল—ছ'তিন নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ

পরদিন প্রভাতে যশোহর যাইবার সময় ট্রেণে সুবোধকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে সন্দেহটা বদ্ধমূল হইল। মনে হইল, পাশার দানটা কেবল দৈবাৎ পড়ে নাই। আমি তাহার গাড়ীতে

গিয়া বসিলাম। তাহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সুবোধচন্দ্র লম্বা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল না।

সাহেবেরা তিন মাস এক জাহাজে ভ্রমণ করিয়া পরস্পরের নাম অবধি জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে ট্রেণে আলাপ করিবার স্পৃহাটা যেন একটু অতিরিক্ত। লোকে ট্রেণে আধ-ঘণ্টা একত্র থাকিলেই পরস্পরের সহিত সখ্যস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। আমি সনাতন প্রথা অনুসারে একটি সিগারেট ধরাইয়া সুবোধকে বলিলাম—ইচ্ছা করুন।

সুবোধ একটু হাসিয়া বলিল—আমি চুরুট খাই না।

আমি বলিলাম,—তা' বেশ করেন। নেশাটা যত কম করা যায় ততই ভাল।

সুবোধ কাগজ পড়িতেছিল। বলিল,—হুঁ!

আমি একটু স্থির থাকিয়া বলিলাম,—কাগজগুলো একঘেয়ে কি লেখে?

সুবোধ পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কাগজখানি আমার হস্তে দিল।

আমি এবার বিপদে পড়িলাম। কাগজখানি পড়িবার ভান করিয়া মুখের সম্মুখে ধরিতে হইল। আমি তাহাকে দেখিবার অবসর হারাইলাম। সুবোধ আমাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল। আমি কাগজখানা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম,—না কিছু নেই।

সুবোধ আবার কাগজখানি লইয়া পড়িতে লাগিল।

আমি তাহাকে নানা রকম তর্কের মধ্যে টানিতে চেষ্টা

করিলাম। বারাসত ষ্টেশনে একটি দশম বর্ষীয়া বালিকার সিন্দুর-রঞ্জিত সিঁথি দেখিয়া বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম, গোবরডাঙ্গার স্ফীতোদর নরনারী দেখিয়া ম্যালেরিয়ার বে-আদবী সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য উদ্গার করিলাম, এমন কি বিধবা-বিবাহের কথারও ইঙ্গিত করিলাম, কিন্তু ফল একই হইল। যশোহরে উভয়েই নামিলাম। সে গাড়োয়ানকে বলিল,—কিরু কেঁইয়ের গদি। আমি ষ্টেশনে একটু অপেক্ষা করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর বাসার দিকে চলিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সরজমিনে

যশোহর হইতে চাঁচড়া যাইবার পথে নির্জ্জন স্থলে একখানি সুদৃশ্য বাঙ্গালায় সুরেন্দ্র বাবু বাস করিতেন। বাঙ্গালার সম্মুখে প্রায় এক বিঘা খালি জমির চারিপ্রান্তে দোপাটি ও কেনা ফুলের গাছ, বাঙ্গালার চারিদিকে বড় বড় আম গাছ। কুটীরটির পশ্চাতে একটু সরু রাস্তার ধারে একটি ডোবা। ডোবার পশ্চাতে বেশ নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী। পরে শুনিয়াছিলাম, সেটী অবনী বাবু নামক একটি যুবক জমিদারের প্রমোদোত্থান। উত্থানের ভিতর একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

সুরেন্দ্র বাবুর কন্যাটির ফটোচিত্র দেখিলাম। মুরলা খুব

সুন্দরী। তাহার চিত্র দেখিলে, যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। সুরেন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন, মুরলার বয়স তের বৎসর মাত্র!

বাঙ্গালার মধ্যে হল ঘরটী বেশ সুসজ্জিত। তাহার এক দিকে দুইখানি ছোট ছোট কক্ষ। একখানিতে সুরেন্দ্র বাবু বসিয়া কাজ করিতেন, অপরখানি তাঁহার শয়নগৃহ। হল-ঘরের অপর দিকের কক্ষ দুইটি অন্দর-মহলের মধ্যে। তাহার পর প্রাচীর-পরিবৃত একটা প্রাঙ্গণে রন্ধন-গৃহ প্রভৃতি ছিল। বাঙ্গালার সম্মুখে খালি জমির এক প্রান্তে একটি গোড়ো ঘরে সুরেন্দ্রবাবুর বাঁশের টম্‌টম্‌ ও টাট্টু ঘোড়া থাকিত।

প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া মুরলা অবনী বাবুর উদ্যান হইতে ফুল তুলিয়া আনিত। যে দিন মুরলা অদৃশ্য হয়, সে দিন প্রভাতে উঠিয়া সুরেন্দ্র বাবু দেখিয়াছিলেন যে, হল-ঘরের বারান্দার দিকের দ্বার উন্মুক্ত। বারান্দায় কতকগুলা আরাম-কেদারা থাকিত। একখানি আরাম-কেদারার উপর তাহার ফুল তুলিবার সাজিটি পাওয়া গিয়াছিল। ইহা ব্যতীত মুরলার অপর কোনও চিহ্ন ছিল না।

সংসারে সুরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী, মুরলা ও একটিমাত্র দশম বর্ষীয় পুত্র। পুত্রটির নাম রমেন্দ্র। রমেন্দ্রও অবনী বাবুর উদ্যানে ভ্রমণ করিত। অবনী বাবু তাহাকে ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন।

আমি বলিলাম—অবনী বাবুর বয়স কত?

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—অবনী বাবু কুড়ি বাইশ বছরের হইবেন। বি, এ পাশ করা খুব ভাল ছেলে।

শুনিলাম, অবনী অবিবাহিত। খুব ঘোড়ার সখ। মাঝে মাঝে সুরেন্দ্র বাবুর বাটীর পশ্চাতের ডোবায় বসিয়া মাছ ধরেন।

আমি একটু বিস্মিত হইলাম। অবনীর নিজের অত বড় পুষ্করিণী থাকিতে তিনি যে কেন পরের ডোবায় মাছ ধরেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একটা জঘন্য সন্দেহ একটু একটু মাথা তুলিয়া মনের ভাবগুলাকে অপবিত্র করিতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—অবনী বাবু কোথায়?

সুরেন্দ্র বাবু বলিতে পারিলেন না—রমেন্দ্র বলিল—তিনি বেনারসে গেছেন।

"কবে?"

"তা বল্‌তে পারিনি। পাঁচ ছ দিন হ'বে।"

হিসাব করিয়া বুঝিলাম—মুরলা অদৃশ্য হইবার দুই একদিন পূর্ব্বেই অবনী বেনারসে গিয়াছেন।

আমি বলিলাম—অবনীর ইয়ার-বন্ধু সব কি রকম?

এবার সুরেন্দ্র বাবু একটু বিরক্ত হইলেন। বিরক্ত হইবার কথা। তিনি বলিলেন—মশাই আমার মেয়ে,—ছোট মেয়ে—ভদ্রলোকের মেয়ে। আর অবনী শিক্ষিত লোক। অতি মধুর প্রকৃতি। তার প্রাণে খুব—

আমি জিব কাটিয়া বলিলাম,—না তা না।

তাহার পর মুরলার জিনিষপত্র অনুসন্ধান করিলাম। ভাঙ্গা টিনের বাক্সে কতকগুলা বিজ্ঞাপনের ছবি, পুঁথির মালা ও একটা

ভাঙ্গা কলমের সঙ্গে তিন খানা পত্র পাইলাম। সুরেন্দ্র বাবুর অসাক্ষাতে পত্রগুলা পকেটস্থ করিলাম। সুরেন্দ্র বাবু টেবিলের উপর একখানা বড় বিচিত্র রকমের লেখা কাগজ পাইলাম। সেখানিও নিঃশব্দে পকেটে পূরিলাম। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একাকী অবনী বাবুর বাটীতে গেলাম। তাঁহার ফটক, পথের অপর দিকে। সে দিকে জনপ্রাণীর বসবাস নাই। অবনীবাবুর একটি বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে নানা কৌশলে অবনীর হস্তাক্ষর সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না। লোকটা জমিদারী সেরেস্তার পুরাতন কর্ম্মচারী; তাহার নিকটে অবনীর কাশীর ঠিকানাও পাওয়া গেল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পত্রাবলী

নরেশ বলিল—"একি হরফ্ বাবা! নিশ্চয় বরমুজ হ'বে।"

আমি বলিলাম—"খোদা জানেন। কাগজ খানা সুরেন্দ্র বাবুর টেবিলের উপর একখানা বইয়ের মধ্যে ছিল, নিয়ে এসেছি।"

নরেশ বলিল—"সুরেন্দ্র বাবুকে বলনি কেন?"

সুরেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বজীবন-সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল। এ পত্রখানা পড়িয়া সে সন্দেহ একটু দৃঢ় হইয়াছিল।

তাই তাঁহাকে পত্রসম্বন্ধে কিছু বলি নাই। পত্রের কোন্ দিক্ সোজা, তাহা নির্ণয় করিতে আমাদের পাঁচ মিনিট সময় গেল।

শেষে একটা বোধগম্য অক্ষর দেখিয়া উল্টা সোজা ঠিক করিলাম। পত্রখানা এইরূপ।

নরেশ বলিল—"এ পত্র নয়। বোধ হয় মুরলা, কি রমেন্দ্র ছবি এঁকেছে।" আমি ঘাড় নাড়িলাম। সে বলিল,—"আচ্ছা বাঙ্গালা চিঠিগুলা পড়।" আমি প্রথম পত্রখানা পড়িতে লাগিলাম।

"রাগ করিয়াছ? অভিমান করিয়াছ? তাই সাক্ষাৎ পাই না। সাক্ষাৎ পাই না চোখে। মনের ভিতর হইতে সরিয়া যাইবে, মানস-নেত্রের অগোচরে লুকাইবে সে সাধ্য তোমার নাই। তুমি আমার উপর রাগ কর, আমাকে ঘৃণা কর, আমার জীবন-পথের ত্রিসীমায় আসিও না। আমি কিন্তু তোমাকে দেখিতে পাইব, তোমার ও মানস-বিমোহন রূপের জ্যোতিতে মজিয়া থাকিব, অহরহঃ তোমার কুরঙ্গনয়ন আমার প্রাণে আনন্দের লহর ছুটাইবে। সে সুখের বিরোধী হও, তখন তোমার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিব। তাহাতে যদি কাঁদিয়া মরিতে হয় তো কাঁদিয়া মরিব—কারণ সে বাসনা তোমার। তোমার বাসনার বিরুদ্ধে কার্য্য করি এমন সাধ্য আমার নাই। তোমাকে ধ্যান করিয়া সুখ পাই সে সুখে বঞ্চিত করিতে চাও, তোমার ধ্যান করিব না। সেই দিন হইতে আমার প্রকৃত দুঃখ আরম্ভ হইবে। সেই দিন হইতে বুঝিব নরক-যন্ত্রণা কি ভীষণ! সেই দিন

হইতে বুঝিব আগুনে ঝলসিয়া মরা কি কষ্ট! এখন বল চোখের আড়াল হইয়া তুমি আমায় ঠিক্ শাস্তি দিতে পার নাই। দেখিবার সুখ অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে ভাবিবার সুখ অধিক! জাগরণে তোমার সুগঠিত দেহ লতার স্পন্দন দেখা অপেক্ষা, স্বপনে তোমার মত সুবর্ণ-লতিকার দর্শন পাওয়া অধিক প্রীতিকর। তোমার কণ্ঠের বীণার ঝঙ্কার শ্রবণ করা অপেক্ষা প্রাণের মধ্যে তোমার সুললিত গীতিরব উপলব্ধি করা অনেক বেশী আনন্দ-দায়ক। তবে কেন চিঠি লিখি? কেন জান? জানিতে চাহি তুমি আমার হৃদয় হইতে তোমার স্মৃতিটুকু মুছিয়া ফেলিতে বল কি না। প্রভাতে উঠিয়া গাছের কোটরে দেখিব। তোমার এই একটা কথার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিব। সুহাসিনী বঞ্চিত করিও না। একটা কথা লিখো—মাত্র একটা কথা।"

পত্রে কোনও তারিখ ছিল না। কাহারও নাম ছিল না। কাহার হস্তাক্ষরে লিখিত তাহাও জানিতাম না। নরেশ কিন্তু সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল যে পত্রখানা অবনী মুরলাকে লিখিয়া-ছিল। সে পত্রের আবেগ-পূর্ণ ভাষা শুনিয়া স্মিতমুখে বলিল— "ওঃ! ছোঁড়া একেবারে জেটিয়ে গেছে। তাই হিন্দুর ছেলের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াব নিয়ম জারি হ'য়েছে।"

আমি বলিলাম,—"তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে কোন্ ছোঁড়া লিখেছে। কা'র চিঠি তুমি আমি কি জানি?"

নরেশ হাসিয়া বলিল—তুমি আমি গাধা নই ব'লেই জানি। মুরলার বাপ যা করে করুক, আমি আজই তাকে বল্‌ব যে

অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, জমীদার মহাশয় একটা উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া তাহার সুন্দরী শিশু সরলা বালিকাটিকে উধাও ক'রে নিয়ে গেছে। হাজার টাকা পকেটে ক'রে মেড়ে' মক্কেলের পাঁচ হাজারের চেষ্টায় লাহোর রওনা হ'ব।

আমি তাহাকে তিরস্কার করিলাম। যদিই অবনীর দ্বারা এ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, মুরলাকে তো উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। নরেশ বলিল—"বেশ, সে কথা ভিন্ন। আচ্ছা আর একখানা পত্র পড়।" আমি পড়িলাম—

"পত্র পাইয়াছ বুঝিলাম, কিন্তু উত্তর দাও না কেন? তোমাকে চোখে না দেখিয়া ধ্যান করিলে থাকি ভাল; একথা লিখিয়াছিলাম বলিয়া? ঘোর মিথ্যা কথা, পাগলের প্রলাপ-বচন। তোমায় না দেখিয়া থাকি ভাল? শুনিয়া নিজেরই হাসি পায়। সাকার দেবীর পূজা ছাড়িয়া নিরাকার দেবীর নীরব মানসিক উপাসনায় আনন্দে থাকি? ভণ্ডামির কথা। পাগল হইয়াছি, ডুবিয়াছি—ডুবিবার সময় তুচ্ছ তৃণগুল্ম যাহা সম্মুখে পাইতেছি প্রাণপণে ধরিতেছি। ধ্যান ধ্যানই ভাল; কিন্তু ধ্যানের কি ক্ষমতা আছে? আসল ছাড়িয়া ছায়া ধরিলে কি প্রাণে শান্তি আসে? চাঁদের আলো ছাড়িয়া চিত্রের শশীর দিকে আজীবন তাকাইলে কি প্রাণোন্মাদক স্নিগ্ধ রশ্মির পরিচয় পাওয়া যায়? সুলোচনে, কথা কহিব না, তোমার চোখের সামনে পড়িব না, তোমাকে এ মুখ দেখাইব না, কিন্তু তুমি একবার দেখা দিও। একটা সামান্য ভিক্ষা দিতে কেন কুণ্ঠিত হইতেছ, একটা

দগ্ধ প্রাণকে শীতল করিতে কেন বিমুখ হও? আমি এখনই তোমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইতে পারি, কিন্তু সেরূপ বিবাহ তো দেশে সর্ব্বত্র হইতেছে। তাহারই ফলে তো গৃহে গৃহে অশান্তি, ঘরে ঘরে অসুখ! একবার বল আমায় ঘৃণা কর না, একবার বল আমায় প্রীতির চোখে দেখিতে পারিবে, তাহা হইলে তোমায় আমার করিব, দু'জনায় জীবনের মত বাসা বাঁধিব, দুই দেহে এক প্রাণে আদর্শের দিকে ছুটিব। তোমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম; কিন্তু মনে রাখিও এ প্রতীক্ষা—ভীষণ প্রতীক্ষা।"

নরেশ বলিল,—"ছোকরা বুঝেছে ভাল। দেশে ঘরে ঘরে অশান্তি আছে—আর তা'র কারণটা হ'চ্চে স্বাধীন প্রণয়ের অভাব। বেশ কথা।" আমি হাসিয়া বলিলাম,—"এই থেকেই বোধ হ'চ্চে যে অবনীর দ্বারা এ কার্য্য হয়নি। লোকটার একটু নীতিজ্ঞান আছে, পেটে বিদ্যে আছে, প্রাণে কবিতা আছে।" নরেশ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—"আর প্রাণের ভেতর আগুন আছে, হাতে পয়সা আছে, অধীনে লোক আছে। এ ক্ষেত্রে অবনীর সঙ্গে সুরেন্দ্র বাবুর কন্যাচুরির ব্যাপারটা যোগ করিতে বড় বেশী কল্পনার দরকার হয় না।"

আমি সে কথার ঠিক প্রত্যুত্তর দিতে পারিলাম না। তৃতীয় পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

"এখন বুঝিলাম কেন সাক্ষাৎ পাই নাই। সব শুনিয়াছি, সব বুঝিয়াছি। গর্ব্ব করিতাম যে, মানুষ নিজের সুখ-দুঃখের

বিধাতা। এখন বুঝিলাম একজন কঠোর নির্ম্মম বিধাতা আমাদের ভাগ্যের উপর আধিপত্য করেন। ভাগ্যের উপর আধিপত্য করেন করুন, কিন্তু আমার মনের স্বামী আমি। তুমি দু'দিন পরে অপরের হইবে তাহা জানি। পরস্ত্রীকে গোপনে ধ্যান করা মহাপাপ, সে কথা হিন্দুর ছেলে আশৈশব বুঝিতেছি। কিন্তু তাহা সত্বেও তোমাকে ভালবাসিব, পরস্ত্রীর ধ্যান করিব, যত দিন বাঁচিয়া থাকিব মনের মধ্যে তোমাকে রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া ষোড়শোপচারে তোমায় পূজা দিব। তাহার পর নরক ভোগ করিতে হয় করিব—স্বর্গভোগ তো প্রথমে করিয়া লই।

"এ পাপের হস্ত হইতে এখন তুমি আমায় বাঁচাইতে পার। তোমার একটা কথায়, একটা ইঙ্গিতে ভগবানের সৃষ্ট জীব চিরদিনের জন্য বাঁচিয়া যায়। একবার বল, তুমি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবে, তখন দেখিবে, আমি তোমাকে ধর্ম্মপত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারি কি না। একটা কথা—একটা ইঙ্গিত। তুমিও বিধাতার মত পাষাণ হইও না।"

নরেশ বলিল,—একটা ইঙ্গিতের ফলে বাছা ধন তা'কে উধাও ক'রে নিয়ে গেছে। তবে একটা ভাল যে, ছোঁড়া মেয়েটাকে বিয়ে করবে।

আমি কিন্তু ঠিক বুঝিলাম না যে, পত্রগুলা অবনীর লিখিত এবং পত্রের সুন্দরী মুরলা।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রেমিক অবনী

অবনীর কাশীর ঠিকানা ভাগ্যক্রমে পাইয়াছিলাম বলিতে হইবে। কয়দিন তাহার বাটীর আশে পাশে ঘুরিয়া ছিলাম। এক দিন দেখিলাম, সেই ফটকের পার্শ্বে মহাসমারোহে ভালুক নাচ হইতেছে। দুইটি ভল্লুক লইয়া নাচওয়ালারা নানা প্রকার তামাসা দেখাইতেছিল। ভল্লুক-বধূ অভিমান করিয়া বসিয়াছিল, তাহার স্বামী যুক্তহস্তে ভগবানকে ডাকিতেছিল।

অবনী বাবুর কর্ম্মচারিবৃন্দ এ দৃশ্যে মোহিত হইয়া গিয়াছিল। ভালুকওয়ালারা সেই অবসরে পয়সা চাহিতে আরম্ভ করিল। অনেকগুলি পয়সা পড়িল ; কিন্তু তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। অবনী বাবুর একটি যুবক কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া একজন ক্রীড়া-প্রদর্শক বলিল,—কর্ত্তা বাবু, আপনার এতো বড় বাড়ী। বুড়োকে একটা কোট দিতে হোবে।

সকলে হাসিল। কর্ম্মচারী বলিল—বাবা, আমার বাবারও বাড়ী না। যাঁর বাড়ী তাঁকে কাশীর গণেশ মহল্লায় পাবে এখন।

কর্ম্মচারীর রসিকতায় সকলে হাসিল। আমি ভল্লুকওয়ালাকে দুইটি পয়সা দিয়া আনন্দিতমনে কলিকাতায় ফিরিলাম।

কাশীতে গিয়া অবনী বাবুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। পরিচয় করি নাই। দূর হইতে কয়েক দিন তাঁহাকে লক্ষ্য করিলাম। তাঁহাকে যতই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, ততই কিন্তু নরেশের সিদ্ধান্তের অসারত্ব উপলব্ধি করিলাম। অবনীর বিলাস-বর্দ্ধিত নধর দেহ, মুখে উচ্চ ভাব প্রকটিত; তবে তাহার চক্ষে তেমন জ্যোতিঃ ছিল না। তাহার চক্ষে একটা অব্যক্ত বেদনার ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল। এরূপ লোকের পক্ষে একটা গৃহস্থের কন্যাপহরণ করা যেন কেমন একটু অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বেশ ভাল রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার মুখে অনুতাপের লেশমাত্র ছিল না।

তাহার হস্তাক্ষর সংগ্রহ করিতে না পারিলেও স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, পত্রগুলা তাহার লেখা। অবনী যে প্রেমিক সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তাহাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছিল। একটা ধনী বংশের কৃতবিদ্য যুবকের পক্ষে ভদ্রলোকের সরলা কুমারী কন্যাকে ওরূপ পত্র দেওয়া যে ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য, ইহার সেটুকু নীতিজ্ঞান ছিল না, ইহা ভাবিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম। ইংরাজি নভেল, বিলাতী আদর্শ এদেশের ক্ষেত্রবিশেষে পড়িয়া কিরূপ কুফল প্রসব করিতেছিল তাহা ভাবিয়া বাস্তবিকই মর্ম্মদাহ হইল। বুঝিলাম, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী যতদিন না যুবকদের হিন্দু করিতে পারিবে ততদিন দেশের অবস্থা মোটেই শুধরাইবে না।

আমাদের সহিত যুবক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্য করিত।

রাখালকে আমরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিতাম রাখাল সেই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। অবনীর সহিত বন্ধুভাবে মিশিবার জন্য রাখালকে বারাণসীধামে আনিয়াছিলাম।

বারাণসীর একটা জনাকীর্ণ ঘাটের প্রস্তর-সোপানের উপর দাঁড়াইয়া আমরা জনতা দেখিতেছিলাম। ঘাটের একটা উচ্চ চাতালের উপর কোট পেণ্টুলেন পরিয়া মাথায় হিন্দুস্থানী পাকড়ী বাঁধিয়া অবনী ভিড়ের প্রতি চাহিয়াছিল। তাহার পার্শ্বে তাহার এক বন্ধু পা ফাঁক করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিলে অবনীর সহিত সখ্য স্থাপন করিতে পারা যায়, রাখালকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অবনীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। দেখিলাম রাখালের সহিত অবনী কথোপ-কথনে নিযুক্ত হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ঘাটের উপর কথাবার্ত্তা কহিয়া রাখাল, অবনী ও তাহার বন্ধুর সহিত সহরের দিকে চলিল। আমি বাসায় ফিরিলাম।

রাখাল ফিরিলে তাহার নিকট হইতে সকল কথা শুনিলাম। অবনীর বন্ধুটি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। অবনী আপনাকে কলিকাতার লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত নাম বলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় রাখালকে বাসায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছে।

আরও তিন চারি দিন কাশীধামে রহিলাম। বিশেষ কিছু সংবাদ পাইলাম না। রাখালকে তাহার প্রহরীস্বরূপ রাখিয়া কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

মোগলসরাই ষ্টেসনে কলিকাতার গাড়ীতে উঠিতে গিয়া ট্রেনে সুমের মলের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে কাশীর গাড়ী হইতে নামিয়াছিল কিনা স্থির করিতে পারিলাম না।

দশম পরিচ্ছেদ

পরিহাস

মুরলার বিবাহের মাত্র দশদিন অবশিষ্ট ছিল। মাত্র দশ দিন প্রায় তাহার দ্বিগুণ কাল এই জটিল প্রশ্ন লইয়া বিধিমতে আলোচনা করিয়াছি, কত দিকে ছুটিয়াছি, কত বাদানুবাদ করিয়াছি, কিন্তু তাহার একটা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রতিদিন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া দিনান্তে যখন নিজ কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতাম, তখন মুরলার কথা মনে হইলেই নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতাম। ভাবিতাম আমরা নিতান্ত অপদার্থ, আমাদের সামান্য শক্তি লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর নিকট গুরুভার গ্রহণ করা অত্যন্ত অবৈধ হইয়াছে। নরেশ আমার মত এত ভাবিত না। স্বভাবতঃই সে আমোদপ্রিয়, একটু লঘুচিত্ত। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ'—সে এই নীতি অনুসরণ করিত। সুরেন্দ্র বাবুর সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহাকে আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমার সর্ব্বদাই মনে হইত, তিনি যেন আমাদের

নিকট হইতে কি একটা গুরুতর ব্যাপার গোপন করিতেছেন। সেই অপাঠ্য লিপিখানা পাইয়া তাঁহার উপর আমার সন্দেহটা বেশ বদ্ধমূল হইয়াছিল। সন্দেহ অপর কিছুই নয়। সন্দেহ হইয়াছিল, তাঁহার পূর্ব্বজীবন-সম্বন্ধে। তিনি মাত্র দেড় বৎসর যশোহরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত কাহারও পরিচয় হয় নাই। তাঁহার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেই এক রকম বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি অর্থলোলুপ। তাঁহার পূর্ব্বজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিতেন। যশোহরে আসিবার পূর্ব্বে তিনি কোন্ দেশে থাকিতেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন পশ্চিমের নানা স্থানে ঘুরিয়া যশোহরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের সহিত তাঁহার কন্যা-হরণের যে একটা সংস্রব ছিল, সে কথাটা আমার মর্ম্মে মর্ম্মে ধ্বনিত হইতেছিল। আর সে বিচিত্র পত্রখানা—সেখানা কি তাহা না জানিলে আমাদের তদন্তের সাফল্য হইবে না, সে কথাটাও কে যেন প্রাণের মধ্যে ঢক্কানিনাদে ঘোষিত করিতেছিল।

আজ সাহসে ভর করিয়া তাঁহার হস্তে সেই পত্রখানা দিলাম। কি মন্ত্রবলে যেন সুরেন্দ্র বাবুর মুখের একটা ভাবান্তর ঘটিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—মশায় এ চিঠিখানা পড়ুন দেখি।

সুরেন্দ্র বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—এ চিঠি আপনি পেলেন কোথা থেকে?

আমি বলিলাম,—মাফ করবেন। একটু বেয়াদবী ক'রে আপনার বাসা থেকে চিঠিখানা চুরি ক'রে এনেছি।

সুরেন্দ্র বাবু ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—এ চিঠির সঙ্গে আপনার তদন্তের কোন সম্পর্ক নেই।

আমি বলিলাম—মশায় সে কথা জানলেন কি করে?

সুরেন্দ্র বাবু একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—আমি চিঠির মর্ম্ম অবগত ব'লেই বল্‌ছি। যে কার্য্য আপনাদের হাতে দিয়েছি তার তদন্ত না ক'রে বাজে—

আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলাম—মশায় তা' যদি মনে হয় ত আপনার মামলা আমাদের হাত থেকে তুলে নিন। কথা গোপন কর্‌লে আমরা কেমন করে আপনার কাজ ক'রব?

সুরেন্দ্র বাবু অপ্রস্তুত হইলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাতর-কণ্ঠে তিনি বলিলেন—আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি সতীশবাবু, যে ও পত্রের সঙ্গে আমার কন্যা-চুরির কোনও সম্বন্ধ নেই।

আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, একটা তদন্ত সম্বন্ধে কোন্ সংবাদটা আবশ্যক কোন্‌টা অনাবশ্যক সে কথা তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে তিনি আমাদের নিকট আসিতেন না। তিনি এ বিষয়টাকে নিরর্থক বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি তাহা হইলে কোনও সুবিধা পাইতে পারি। আমার নিকট এ কথাটা তাঁহার প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—সতীশবাবু, বিষয়টা আমার ব্যক্তিগত কোনও গোপনীয় ব্যাপার আছে। এর সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনও সংস্রব নেই।

আমি।—আচ্ছা মুরলাকে হারাবার ক'দিন পূর্ব্বে আপনি এ পত্র পেয়েছেন ?

সুরেন্দ্রবাবু আমার হস্ত হইতে পত্রখানা লইয়া বলিলেন,—প্রায় দশদিন পূর্ব্বে।

আমি।—পত্রে কি লেখা আছে ?

সুরেন্দ্র। মাফ্ করবেন। আমরা যে কয় জন এই হরফ জানি প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লেখার রহস্য প্রকাশ করতে পার্‌ব না।

আমি পত্রখানা এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া বলিলাম,—আচ্ছা, ইহার ভাবার্থ বল্‌তে দোষ আছে ?

তিনি বলিলেন,—আপনি একটা ভুল কর্‌ছেন। চিঠিখানা এমন বিশেষ কিছু না। কোনও লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে এতে আমার নিমন্ত্রণ আছে।

আমি।—বন্ধুর ?

সুরেন্দ্র।—হ্যাঁ,বন্ধু বটে,তবে আপাততঃ মনোমালিন্য হ'য়েছে।

আমি।—সাক্ষাৎ হ'য়েছিল কি ?

আমার জেরায় বিরক্ত হইয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—ইহার সহিত কন্যাচুরির কোনও সম্পর্ক নাই। এ পত্র-প্রেরকের সহিত আমার বন্ধুত্ব লোপ পাইলেও, আমার কন্যা আমার যেমন প্রিয়পাত্রী, তাহারও তেমনি স্নেহের। পত্রপ্রেরকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। তিনি এ সংবাদে আমারই মত বিপন্ন।

অবশ্য এ কথার উপর আর জেরা চলে না। একটু অপ্রস্তুত হইলাম। তবু নিজের সন্দেহ মিটাইবার জন্য বলিলাম,—দ্বিতীয় লাইনে যে একটা ৭ রয়েছে সেটা কি আমাদের সাধারণ সাত ?

সুরেন্দ্র বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—পূর্ব্বেই ত বলেছি ও বিষয়ে ক্ষমা করতে হ'বে। এখন কাজের কথা হ'ক। আমি তো স্থির করেছি শীতলপ্রসাদ বাবুকে সকল কথা খুলে বল্‌ব। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ব। তাঁর টাকা ফেরত দিয়ে সপরিবারে চিরদিনের জন্য পশ্চিমে চলে যাব।

কথাটা আমার হৃদয়ে বাজিল। নিজে যে একটা অপদার্থ জীব তাহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম। আপনাকে ধিক্কার দিলাম। এ ব্যাপারে যে ভদ্রলোকের দুর্গতির চূড়ান্ত হইবে, শেষে লোকলজ্জার ভয়ে তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম,—সুরেন্দ্র বাবু, এখনও তো আপনার দশ দিন সময় আছে.আমাকে আর সাত দিন সময় দিন। তাহার পর যা' অভিরুচি হয় করবেন।

তাঁহাকে এ কথা বলিবার বিশেষ কারণ ছিল। নরেশের ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, শিক্ষিত অবনীমোহনই মুরলাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে তাহার সহিত একমত না হইলেও আমি প্রত্যহ রাখালের রিপোর্ট পড়িতাম। সে দিন দিন অবনীর বিশ্বাসভাজন হইতেছিল। রাখাল শেষ পত্রে

লিখিয়াছিল যে শীঘ্রই একটা নূতন সংবাদ দিবে। নূতন সংবাদটা কি তাহা অবশ্য বুঝিতে পারি না। নূতন সংবাদটা নিশ্চয়ই একটা শুভ সংবাদ হইবে এইরূপ অনুমান করিয়া তাহাকে বলিলাম,—নিরাশ হবেন না। এখনও সময় আছে।

তাঁহার কিন্তু ঐ কথায় সাহস হইল না। নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া ভদ্র লোক কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, —সতীশ বাবু, আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। যখন সাধারণ জ্ঞানে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, আমার সাফল্যের কোনও উপায় নেই, তখন কেবল জোর ক'রে হৃদয়ে আশার সঞ্চার করা, সেই আশায় প্রাণধারণ করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা ভগবানই জানেন। নিরাশায় বুক বেঁধে বৃথা আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, নূতন জীবন যাপন করায় এক রকম সুখ আছে। আমি আজই এ কার্য্যের শেষ করব।

আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম তিনি একেবারে ধৈর্য্য হারাইয়াছেন।

শেষে ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি কলকাতা থেকে কতক-গুলা জিনিষ কিনে আজই যশোরে ফির্‌ব। আপনার বন্ধুর সঙ্গেও একবার সাক্ষাৎ কর্‌বার বাসনা ছিল। তিনিও আমার জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

তাঁহাকে অধৈর্য্য হইতে নিষেধ করিলাম। নরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা। আমি বাজার ক'রে আবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব।

সুরেন্দ্রবাবু চলিয়া যাইবা মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই মিঃ এন্ সেন প্রাইভেট ডিটেক্‌টীভ সশরীরে চুরুট টানিতে টানিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার শুষ্ক মুখ দেখিয়া বলিলেন,—কি হে রাত্রিচর পক্ষীবিশেষের মত মুখখানা ভার করে রেখেচ কেন?

আমি বলিলাম,—তোমার ভাবনা কি বল? তুমি ডিস্‌পেনসারি জানালার লাল জল ভরা সাজানো শিশি। ঝক্কিতো আর তোমার সইতে হয় না। আমার অবস্থায় পড়্‌লে বুঝ্‌তে।

নরেশ হাসিয়া বলিল,—কেন, আলমারির আদত ওষুধের বিষণ্ণতার কারণ কি?

আমি বলিলাম—কারণ কি? সুরেন্দ্রবাবুকে দেশছাড়া কর্‌লাম।

নরেশচন্দ্রকে সুরেন্দ্রবাবু-সংক্রান্ত সকল বিষয় বলিলাম। সমস্ত কথা শুনিয়া মিঃ সেন বলিলেন,—যখন আমার ফার্ম্মে তাঁর কেস পড়েছে, তখন কিছুই মন্দ হ'বে না। দেখনা, আমি দুই কথায় তাঁকে জল করে দে'ব।

আমি বলিলাম,—তাঁর পর?

নরেশ গম্ভীর ভাবে বলিল—তার পর, সবুরে মেওয়া ফল্‌বে। তুমি স্থির হ'য়ে দেখ না।

আমি বলিলাম,—না, না, একটা কেলেঙ্কারী ক'র না, বাজারে জুয়াচোর বদনাম হ'য়ে যাবে।

নরেশ হাসিয়া বলিল,—নাম, বদনাম কা'র? মহাশয়কে কটা লোক চেনে?

আমি দুঃখের সময়ও হাসিয়া ফেলিলাম। এমন সময় বিষণ্ণবদনে কন্যা-শোকাতুর সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নরেশ সপ্রতিভভাবে বলিল,—"কি সুরেন্দ্র বাবু? এ সব কথা কি শুন্‌তে পাচ্ছি? আপনি না কি দেশত্যাগী হ'চ্চেন?"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—হ্যাঁ। কালই রওনা হ'ব মনে ক'রেছি।

নরেশ সিগারেট টানিয়া বলিল,—বটে?

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—নিশ্চয়ই যাব। তবে একটা শেষ ভিক্ষা ক'রব।

নরেশ নির্ব্বিকারভাবে বলিল—যথা?

তাহার লঘুতা আমার পক্ষে বিরক্তিকর হইতেছিল। কিন্তু কি করি ফার্ম্মের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপনার অংশীদারকে মক্কেলের সম্মুখে কিছু বলিতেও পারিলাম না।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—আমি বিদেশে গিয়েই আমার ঠিকানা আপনাদের জানাব। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে সে সংবাদটা কা'কেও দেবেন না। আর বলা বাহুল্য, আমার কন্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর্‌তে ভুলবেন না। তার সংবাদ কিছু পেলেই আমাকে টেলিগ্রাফ কর্‌বেন।

নরেশ বলিল,—আর আপনার কন্যার সংবাদ যদি তা'র পূর্ব্বেই পাই।

একটা মর্ম্মভেদী নিরাশার স্বরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—এমন ভাগ্য কি আমার হ'বে মশায়?

নরেশ বলিল,—আপনার ভাগ্য ফিরেছে। আপনার কন্যা শীঘ্রই পাবেন।

নরেশের ক্রিয়াকলাপ আমার নিকটে একটু নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সৌভাগ্য

ব্যাপারটা ক্রমশঃই প্রহেলিকা-সমাচ্ছন্ন হইতেছিল। রাখালের পত্রে অবনীর যে বর্ণনা পাইতাম, তাহাতে তাহার উপর আদৌ সন্দেহ হইত না। রাখাল লিখিত, অবনীর কথাবার্ত্তা হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যাইত তাহাতে তাহাকে চরিত্রবান্ পুরুষ বলিয়া মনে হইত। সে এতদিন তাহার সহিত মিশিয়া তাহাকে যশোহর সম্বন্ধে কোনও কথা কহাইতে পারে নাই। সে তাহার ভৃত্যদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া কোনও রহস্যের আভাস পায় নাই। তাহার বাটীতে মুরলা থাকিত না, সে বিষয়ে রাখালের কোনও সন্দেহ ছিল না। অবনীর এত ঐশ্বর্য্য, এত নীতিজ্ঞান, এত সমাজহিতকর প্রবৃত্তি—অবনী কিন্তু হাসিত না, সহজে জনসমাজে মিশিত না, সর্ব্বদাই চিন্তাশীল থাকিত। তাহার প্রাণের মধ্যে যে সুখের লেশ ছিল না তাহা রাখাল বেশ বুঝিয়া-

ছিল। নূতন দেশে ভ্রমণ করিতে গেলে লোকে সাধারণতঃ একটু রঙ্গরস ভালবাসে, পাঁচ জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করিতে ব্যগ্র হয়। অবনী একেলা থাকিতে ভালবাসিত। মিশিত,—কেবল তাহার অন্তরঙ্গ কলিকাতার বন্ধুটীর সহিত।

রাখাল সে বন্ধুটির কোনও সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার বাটীতে প্রবেশ করিবারও অবসর পায় নাই। সে বাটীতে স্ত্রীলোক থাকিত তাহা রাখাল বুঝিয়াছিল। কিন্তু কোনও মতে সে জানিতে পারে নাই তথায় মুরলা ছিল কি না।

সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিলে এক একবার অবনীর প্রতি সন্দেহ হইত। সে সন্দেহ অপনোদনের কোনও উপায় ছিল না। তাহার ভণ্ডামির মুখোসটার জন্য তাহার চরিত্র আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পক্ষে মুরলাকে লুকাইয়া রাখা যে একেবারে অসম্ভব, সে কথা কখনও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিত না!

অপর পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে সন্দেহ হইত,—তাহার পিতার বন্ধুর উপর। মর্ম্মান্তিক কলহের ফলেও কোনও ব্যক্তির পক্ষে বালিকাকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে! এ-ধারণার সাক্ষ্য সেই পত্রখানা। যে সকল ব্যক্তির মধ্যে ঐরূপ অসাধারণ রকমের বর্ণমালা প্রচলিত, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও একটু অসাধারণ রকমের। সেই অস্বাভাবিক শত্রুতার ফলে কন্যা-চুরি সম্ভবপর ব্যাপার।

এইরূপ বিচার করিয়াই পূর্ব্ব হইতে আমার মনোমধ্যে দুইটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—প্রথমতঃ যে বালিকা মুরলার প্রণয় ভিক্ষা করিয়া ওরূপ মর্ম্মস্পর্শী পত্র লিখিয়াছিল, সে প্রেমিক যুবকটি কে? দ্বিতীয়তঃ এই সঙ্কেতলিপিজ্ঞ ব্যক্তিগণই বা কাহারা?

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাইবার কোনও উপায় ছিল না। প্রথম প্রশ্ন-সম্বন্ধে মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, অবনীমোহনই সেই প্রেমিক যুবক। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাই নাই। তাহার হস্তাক্ষর পাইতে এই তিন সপ্তাহ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ সামান্য কার্য্যটায় কৃতকার্য্য হই নাই। প্রথম হইতেই এই বালিকাহরণ ব্যাপারটার উপর কেমন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

একটু অবসর লইবার জন্য আমার এক অন্তরঙ্গ পুরাতন বন্ধু দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। ডাক হরকরা আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। তাহার উপরের হস্তাক্ষর দেখিয়া আমার হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। চিঠিখানির ঠিকানা ইংরাজিতে লেখা, কিন্তু উপরের নামটি বাঙ্গালায় লিখিত। আমি পত্রখানা হাতে লইয়া বারংবার পড়িলাম,—"শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মিত্র, বি. এ, সুহৃদ্বরেষু।

দেবেন্দ্র বলিল,—কিহে ও পত্রখানা অত বারংবার পড়ছ কেন? কিছু টিকটিকিগিরি করবে নাকি?

আমি সপ্রতিভ হইয়া বলিলাম,—না। এ নূতন ধরণের

ঠিকানা লেখা দেখে একটু আশ্চর্য্য হচ্চি। ফ্যাসানটা লক্ষ্মীর মত চঞ্চল। এটা হাল ফ্যাসান বোধ হয়।

দেবেন্দ্র বলিল,—হ্যাঁ, ও ছোকরা বেশ ফ্যাসানেবল! আমার ভায়ার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আমি বলিলাম—এতো বেনারসের ছাপ দেখছি।

দেবেন্দ্র বলিল—হ্যাঁ, অবনী বড় লোকের ছেলে। মাথার উপর অভিভাবক নেই। খুব পশ্চিমে ঘুরছে।

অবনীর নামে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তাহা হইলে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহা তো সত্য। নরেশের বুদ্ধির প্রখরতা আছে। সেই প্রেম-পত্রগুলার হস্তাক্ষরের সহিত এ হস্তাক্ষরের কোনও পার্থক্য ছিল না। এ অবনী যে সেই অবনী তাহা স্থিরীকরণের জন্য তাহাকে আরও গোটাকতক প্রশ্ন করিলাম। দেখিলাম, পত্রপ্রেরক যশোহর জেলারই অবনী।

বলা বাহুল্য, তাহার হস্তাক্ষরটা দেখিবার জন্য বড়ই প্রলোভন হইল। প্রকাশ্যভাবে হস্তাক্ষরটা সংগ্রহ করিতে গেলে অবনী সতর্ক হইয়া যাইতে পারে। হেমন্ত তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কে জানে সেও এ রহস্যের ভিতর আছে কি না? সে অবনীকে সতর্ক করিয়া দিবে। এ এক নূতন সমস্যার ভিতরে পড়িলাম।

ঠিক এই সময় হেমন্ত আসিয়া নমস্কার করিল।

আমি বলিলাম,—কি হে, আজ সকালে Law lecture যাও নি?

হেমন্ত বলিল,—আজ্ঞে না। আজ শরীরটা ভাল নেই।

তাহার দাদা তাহাকে **অবনীর** পত্রখানা দিল। হেমন্ত লেফাফাটা ছিঁড়িয়া পত্রখানা একবার বাহির করিল, তাহার পর বোধ হয় তাহার বৃহদায়তন দেখিয়া লেফাফায় পুরিয়া পকেটে রাখিল। আমি আগ্রহসহকারে দেখিয়া লইলাম যে, পত্রের ভিতরকার অক্ষরগুলা সেই এক হস্তের। শুধু তাহাই নহে, পত্রের স্বাক্ষরের স্থলে "অবনী" ও তাহার কয়েক ছত্র উপরে "মুরলার" এই কথা দুইটা আমার নয়নপথে পড়িল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি ঐ পত্রখানা চুরি করিতে না পারি তাহা হইলে আমি গরু। উপস্থিত সামান্য একটু হাতের লেখার নমুনা পাইবার জন্য এক উপায় অবলম্বন করিলাম।

দেবেন্দ্রকে বলিলাম,—ভাই তোমার নস্যটি বড় ভাল। একটু বাড়ী নিয়ে যাব।

দেবেন্দ্র বলিল,—তার আর কথা কি।

আমি হেমন্তের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—ভায়া একটু কাগজ দাও না।

আজ সৌভাগ্যের দিন। হেমন্ত সটান সেই পত্রখানা বাহির করিয়া আমার হস্তে শূন্য লেফাফাটা দিল।

আমি সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলিলাম,—না, না, ও বন্ধুর চিঠির লেফাফাটা কেন?

হেমন্ত বলিল,—না, ওতে আর দরকার কি?

আমি তাহাতে নস্য পুরিতে পুরিতে মনে করিলাম—তোমার

দরকার না থাকিতে পারে। কিন্তু একটা ভদ্রলোকের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে ইহা বড়ই দরকারী।

এই ত গেল সৌভাগ্য নম্বর এক। প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ট্রামে বসিয়া ব্যাপারটা পূর্ব্বাপর ভাবিতেছিলাম। আর চার পাঁচ দিন পরেই বিবাহের দিন। ইতিমধ্যে নরেশ কি একটা বৃথা আশা দিয়া কোনও প্রকারে সুরেন্দ্র বাবুকে দেশত্যাগ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাইয়াছিল। এই চারিদিনের মধ্যে আমাদের পক্ষে সফলকাম হওয়া যে কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল যে, চারিদিন পরে বিবাহ-বিভ্রাট ঘটিবে। তখন কেবল সুরেন্দ্র বাবুকেই লোকলজ্জার ভয়ে দেশত্যাগী হইতে হইবে তাহা নহে, তাহার সহিত বোধ হয় অপমানিত হইয়া আমাদেরও অফিস বন্ধ করিয়া দুইজনকে অপর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ট্রামে আমার পার্শ্বে যে ভদ্রলোকটী বসিয়াছিলেন, তিনি হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামিয়া গেলেন। তিনি ট্রামের নির্গমনের পথের দিকে বসিয়া ছিলেন। আমি তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানের দিকে সরিয়া গিয়া দেখিলাম, তিনি একখানি পত্র ফেলিয়া গিয়াছেন। পত্রের উপর ঠিকানা লেখা, "বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র, ২৮ নং হ্যারিসন রোড" ট্রাম হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম লোকটি চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম যদি প্রয়োজনীয় পত্র হয় তো উক্ত ঠিকানায় দিব। অন্যমনস্কভাবে পত্রখানা লেফাফার

ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিলাম। ভিতরের লেখা দেখিয়া আমি উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম কি সৌভাগ্য! সেই গুপ্ত সমিতির অন্ততঃ অপর একজন লোকের ঠিকানা পাইয়াছি। যদি সুরেন্দ্র বাবু না বলেন, তাহা হইলে এই লোকগুলার অনুসরণ করিয়া সমিতির রহস্য পাইব। সমিতির রহস্যের সহিত কন্যাচুরির রহস্য জড়িত, তাহা আমার প্রাণের ভিতর অনুভব করিতেছিলাম।

আবার একবার পত্রখানা দেখিলাম। ঠিক সেই সুরেন্দ্র বাবুর টেবিলের পত্রের মত সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়াই দেখিলাম, মিঃ সেন টেবিলের উপর কতকগুলা কাগজপত্র ছড়াইয়া বামহস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া দক্ষিণ হস্ত একটা "Magnifying glass" লইয়া সম্মুখস্থ কাগজগুলার লেখা পরীক্ষা করিতেছে।

আমি বলিলাম, কি হে, অত মনোযোগী হয়ে কি দেখ্‌ছ?

নরেশ চমকিয়া বলিল,—কে তুমি! একটা বড় মস্ত সত্য আবিষ্কার করেছি, মুরলার সেই প্রেমপত্রগুলা অবনীর দ্বারা লিখিত।

আমি বলিলাম,—কি রকম?

সে বলিল, সুরেন্দ্র বাবুর মারফত অবনীর হাতের লেখা সংগ্রহ করেছি। এই দেখনা পত্রের হাতের লেখা তার হাতের লেখার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে।

আমি দেখিলাম, বাস্তবিকই দুই হাতের লেখা এক। আমি

পকেট হইতে ধীরে ধীরে হেমন্তের লেফাফা খানি বাহির করিয়া তাহার পার্শ্বে রাখিলাম ; তিনটি লেখা মিলিল।

নরেশ সাগ্রহে বলিল,—এটাও যে দেখ্‌চি অবনীর হস্তাক্ষর, কোথা পেলে ?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—দুঃখ যেমন একেলা আসে না, সৌভাগ্যও তেমনি দল বেঁধে আসে। আবার দেখ !

আমি টেবিলের উপর সেই বিচিত্র অক্ষরে লিখিত লিপিখানা রাখিলাম। নরেশ আনন্দে চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম,—অত আনন্দে কাজ নাই। আমি স্নান করতে যাই। তুমি এই পত্রখানার অবিকল নকল কর দেখি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চিঠির মালিক

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, কলিকাতার রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থিত দীপমালা সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করিতেছিল। দিবাবসানে, কোলাহলের উপশম না হইয়া বরং তাহা বৃদ্ধি পাইতেছিল। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে লোকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। কতকগুলা ফেরিওয়ালা চটিজুতা বিক্রয় করিতেছিল, একজন কতকগুলা পুরাতন পুস্তক বিছাইয়া সুলভ বিদ্যার প্রসার করি

ছিল। আমি চোখে একটা চসমা দিয়া ২৮ নং হ্যারিসন রোডের দরজার নিকট আসিয়া একটি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অবিনাশ বাবু কোথা ?"

বাড়ীর গতিক দেখিয়া বুঝিলাম, সে বাসাবাটি। কোনও পরিবারের তথায় বসবাস নাই।

ভৃত্যটি নানা প্রকার জেরা করিল ; শেষে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাবুকে সংবাদ দিতে গেল। আমি ইত্যবসরে বাটীটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া লইলাম। বাটীটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার। একটি দশ হাত পরিমিত চারচৌকা উঠানের চারিদিকে ঘর—ত্রিতল অবধি উঠিয়া গিয়াছে। কেবল দ্বিতল ও ত্রিতল ঘরের কোলে বারান্দা আছে। ভৃত্য আসিয়া আমাকে দ্বিতলের একটা কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল।

কক্ষটি ছোট হইলেও বেশ সজ্জিত। অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। জানালায় পরদা দেওয়া, ঘরের মেজে সতরঞ্চ বিস্তৃত। অর্দ্ধভাগে সতরঞ্চের উপর চাদর পাতিয়া একটা বিছানা করা হইয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা হারিকেন ল্যাম্প। সেই অস্ফুট আলোকে বসিয়া গৃহস্বামী আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমি সকালে ট্রাম গাড়িতে তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই। তিনিই প্রাতঃকালের আরোহী কিনা ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমাকে বসিতে বলিয়া তিনি আমার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম,—মহাশয়ের নাম কি অবিনাশচন্দ্র মিত্র ?

তিনি বলিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি বলিলাম—মহাশয় কি সকালে কর্ণওয়ালিসের ট্রামে আসিতেছিলেন ?

আমার দিকে একটু দেখিয়া তিনি বলিলেন,—হ্যাঁ। কেন বলুন দেখি ?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—অপর কিছুই নয়। আপনি এই পত্রখানা ট্রামে ফেলে এসেছিলেন।

সাগ্রহে অবিনাশবাবু আমার হাত হইতে পত্রখানা লইয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি ইত্যবসরে বেশ করিয়া তাঁহার আকৃতিটা লক্ষ্য করিয়া লইলাম। অবিনাশের বয়স আন্দাজ চল্লিশ বৎসর হইবে। মুখে একটা ধূর্ত্ততার ভাব, শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

আমার দিকে ফিরিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়া অবিনাশ বলিল, —মহাশয় কি পত্রখানা পড়েছেন ?

আমি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম,—কি! আমাকে এত নীচ ভাবলেন ? যে ভদ্রলোক একখানা চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে সেটা মালিকের কাছে নিজে নিয়ে আসে সে এতটা নীচ নয়।

অবিনাশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—মাফ্ করবেন। আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি আপনাকে অপমান করবার জন্যে বলি নি। এ পত্রখানা এরূপ ভাষায় লেখা যে আপনি পড়্‌তে পারবেন না। তাই পরিহাস করে ও কথা বল্‌লাম।

আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি এইরূপ ভান করিয়া বলিলাম,—কি রকম ?

হাসিতে হাসিতে অবিনাশচন্দ্র লেফাফা হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া আমার হস্তে দিল। আমি তো সেই পত্রখানা দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, অবাক্ হইয়া এ পিট ও পিট উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার বিস্ময়াতিশয্য দেখিয়া অবিনাশ মনের সাধে হাসিতে লাগিল।

আমি পূর্ব্ববৎ ভান করিয়া বলিলাম,—মহাশয় বুঝি বর্ম্মায় ছিলেন ? বর্ম্মার লেখাগুলা বিচিত্র।

অবিনাশ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার মত একটা অজ্ঞ লোককে লইয়া রহস্য করিয়া একটু বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য অবিনাশ বলিল,—মশায় ঠিক বল্‌তে পারলেন না। লেখাগুলা বর্ম্মার নয়, চীনের।

আমি বলিলাম,—মহাশয় পরিহাস করবেন না। চীনের অক্ষর তো উপর থেকে নীচের দিকে লিখ্‌তে হয়।

অবিনাশ বলিল,—না,মশায় পূর্ব্বেই ঠিক বলেছেন, লেখাগুলা বর্ম্মিজ।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—তবে মশায় মাফ করবেন। আপনার কথায় সন্দেহ করলাম। এ লেখা বর্ম্মিজ নয়। কেহ বিদ্রূপ করে আপনাকে এই হিজিবিজি চিত্রগুলা পাঠিয়েছে।

এ কথাতেও প্রফুল্ল অবিনাশচন্দ্রের হাসি আসিল। সে ধীরে

ধীরে আপনার পকেটের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া বলিল,—পরিহাস বল্‌ছেন, এই দেখুন। এও কি পরিহাস ?

আমি পত্রগুলা পরীক্ষা করিবার ভান করিয়া লেফাফার উপরিস্থিত ছাপগুলা দেখিয়া লইলাম। যে খানায় আধুনিক তারিখ ছিল, সে খানিতে যশোহরের ছাপ ছিল। লেখা সম্বন্ধে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম। যেখানে অঙ্ক লিখিত হইয়াছে, সেইখানেই বাঙ্গলার অঙ্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সাঙ্কেতিক অক্ষর সম্বন্ধে একটা বিষয় সিদ্ধান্ত করিলাম। সিদ্ধান্তটা অপর কিছুই নহে—তাহাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় রাশিসম্বন্ধীয় সঙ্কেত নাই।

তাহার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বিদায় লইতেছি, এমন সময় সেই ঘরে আমার পূর্ব্বপরিচিত মেঘরাজ সুমের মলের গদীর অংশীদার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বের সকল কথা মনে পড়িল। সে আমাদিগের আফিসে দুইবার আসিয়াছিল। সুবোধের যশোহর-যাত্রা প্রভৃতি কথাগুলাও আমার সিদ্ধান্তগুলার সহিত মিশিয়া আমার তদারক ফলটাকে একটা বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে ফেলিল। মেঘরাজ আমাকে দেখে নাই বলিয়া চিনিতে পারিল না। আমি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায়অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিবার পর মেঘরাজ বাহিরে আসিল। আমি গোপনে তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম।

শেষে সেই বড়বাজারের পূর্ব্ববর্ণিত বাটীতে মেঘরাজ প্রবেশ করিল। আমি ভগ্নমনোরথ হইয়া ধীরে ধীরে নিজের বাসায় ফিরিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অবনীর পত্র

নিজের ঘরে বসিয়া কাগজপত্র ছড়াইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ নরেশ আসিয়া বলিল,—"পত্রখানা পড় দেখি।" আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া একটু হাসিয়া পড়িতে লাগিলাম—

"ভাই হেমন্ত!

"তোমার পত্র পাইয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই তোমার স্নেহপূর্ণপত্র খানির উত্তর দিতে বিলম্ব করিলাম। জানি তোমার মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পত্র লিখিতে গেলে নিজের কথা না লিখিয়া থাকিতে পারি না। তাই কাগজ কলম লইয়া তোমাকে পত্র লিখিতে বসিতে মোটেই ইচ্ছা করে না। আমার নিজের কথা লিখিয়া তোমাকে বিরক্ত করিতে আদৌ ভাল লাগে না। কেন তাহা শুনিবে? আমার অতঃপতনের মাত্রাটা উপলব্ধি করিতে পারিলে আমার প্রতি সহানুভূতিতে তোমার উচ্চ হৃদয়টা ভরিয়া উঠিবে তাহা আমি বেশ

জানি। আমি সর্ব্বদা কিরূপ মানসিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকি সে কথা শুনিলে হয়তো তোমার চক্ষে জল আসিবে। অপরিচিত ব্যক্তির নিকট সেগুলা হাসির কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমার জীবনের ঘটনাগুলা তুমি তো আর সে চক্ষে দেখিতে পারিবে না। তোমার নিকট আত্মজীবনী বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলে তোমাকে শোকগ্রস্ত করা অনিবার্য্য। সুতরাং এত দিন তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই। ভাল করি নাই কি?—

আমি এই অবধি পাঠ করিয়া একটু থামিলে নরেশ বলিল,—এতো দীর্ঘ ভূমিকা হ'ল, কিন্তু এর মধ্যেও তার অপরাধের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্চে।

আমি ঠিক তাহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। একটু বাদানুবাদের পর পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

"এক একবার ভাবি কি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র গঠন করিতে গিয়া কি করিলাম। মাঝে মাঝে কলেজের সেই দিনগুলা স্মরণ করি—যখন আমরা মহা আগ্রহে সমাজ-সংস্কারের উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হইতাম, যখন হিন্দু সমাজের অধঃপতনের কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতাম এবং ভীষণ বাক্‌যুদ্ধের পর সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করিতাম যে বাল্য-বিবাহ ও রমণীনিগ্রহ, জাতিভেদ ও কুসংস্কার প্রভৃতি রাক্ষসগুলা সমাজের বক্ষে বসিয়া রক্তশোষণ করিতেছে। মনে পড়ে, তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, হিন্দুবিধবাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে এই জাতি ছয়

শত বৎসর ধরিয়া এরূপ লাঞ্ছিত হইতেছে। তখন আমরা ভাবিতাম যে, ভবিষ্যতে সমাজের দুঃখ মোচন করিয়া বীরত্ব দেখাইব, সৎসাহস দেখাইব, এই অধঃপতিত আর্য্যসমাজের দুঃখ-গুলাকে দূরীভূত করিব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন কি করিতেছি একবার ভাব দেখি। ছিঃ ছিঃ পূর্ব্বে কি জানিতাম যে, আত্ম-সুখ-চেষ্টায় সে সব উচ্চ সঙ্কল্প জলাঞ্জলি দিয়া নিরাশার ভগ্ন স্তূপে বাসা বাঁধিয়া দীনভাবে কালাতিপাত করিব?"—

নরেশ বাধা দিয়া বলিল,—দাঁড়াও দাঁড়াও নিরাশার কথা কি একটা বল্লে? তাহ'লে তো আর আমাদের ধারণাটা ঠিক হয় না।

আমি পত্রখানা একটু দেখিয়া বলিলাম,—না, সে পরের লাইনে নিরাশার কারণটা বিবৃত করেছে।

নরেশ বলিল,—কি রকম?

আমি পড়িলাম,—"যখন হৃদয়ের উচ্চাশাগুলাকে পূর্ণ করিতে পারিলাম না, তখন আধুনিক অবস্থাটাকে নিরাশার অবস্থা না বলিব কেন?"

নরেশ বলিল,—হ্যাঁ। আচ্ছা পড়ে যাও।

আমি পড়িলাম—

"ঐ দেখ, কেমন মনের আবেগে নিজের কথাই আরম্ভ করিয়াছি। এত স্বার্থপর হইয়াছি যে, একবার উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, আমার বেদনার কথাগুলা শুনিলে তোমার হৃদয়ে কোনওরূপ তৃপ্তি হইবে না, বরং বেদনার উদ্রেক হইবে। ভাই, তোমাকে নিজের কথা বলিব না, কাশ্মীর বর্ণনা দিব। এস্থানটিও

আদর্শ-বিচ্যুত—গভীর নিরাশার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমার পূর্ব্ব পত্রে যে বর্ণনা দিয়াছি তাহাতে বোধ হয় সে কথা লিখিয়াছি। আজ—"

আমি পত্রপাঠ বন্ধ করিয়া বলিলাম,—এবার কাশীর বর্ণনা। শুনবে?

নরেশ বলিল,—বাঃ শুনব না? তুমি সমস্ত চিঠিখানাই পড়ে যাও।

আমি আবার আরম্ভ করিলাম,—"সকল দেশের হিন্দু অধিবাসীর প্রতিনিধি এই প্রাচীন পবিত্র তীর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মুক্তকচ্ছ কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠ পর্ব্বতবাসী নেপালী পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিই এই মহাতীর্থের রাজপথে ঘাটে মাঠে মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বারাণসীর আসল অধিবাসী হিন্দুস্থানী পাণ্ডারা। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের পেশা ব্যায়াম অভ্যাস করা এবং দূরপ্রদেশ হইতে অসহায় ব্যক্তি আসিয়া পড়িলে যথাসম্ভব তাহাদের অর্থ নিজ ধন সম্পত্তির অন্তর্ভূত করিবার চেষ্টা করা। সিদ্ধি ইহাদিগের অতিশয় প্রিয় বস্তু। তীর্থযাত্রী ব্যতীত অনেক বাঙ্গালী নরনারী এ স্থলে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাশীর একটা অংশকে এই জন্য বাঙ্গালীটোলা বলে। এই সকল কাশীবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকেই পেন্‌সন্‌-প্রাপ্ত ব্যক্তি। এখানে পরিবারে বাস করিবার উদ্দেশ্য, বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা এবং মৃত্যুর পর শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া। ইঁহাদের মধ্যে সাধুচরিত্র লোকের অভাব

নাই। কিন্তু কতকগুলিকে দেখিয়া মনে হয় যে, এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিয়াও তাঁহারা যৌবনের সেই সংগ্রামপ্রিয়তা রেশারেশি দলাদলি প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। পরের কথা লইয়া আন্দোলন করা এ শ্রেণীর লোকের একটা মহা আনন্দ। তবে শারীরিক উত্তেজনা ও বলের অভাবে ইহারা যৌবনের উদ্যমে এই কার্য্যগুলা করিয়া উঠিতে পারে না।

"এখানকার অনেক বাঙ্গালী অধিবাসীর এক একটা ইতিহাস আছে। আবার কতকগুলি স্ত্রীলোক-সম্বন্ধেও নানা কুকথা শুনিতে পাওয়া যায়। ভাবগতিক দেখিয়াও তাহাদের সম্ভ্রান্ততা-সম্বন্ধে একটা খুব প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হয় না। সেদিন বাজারে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একটি অতীতযৌবনা অথচ বিলাসপ্রিয়া বিধবা মৎস্য ক্রয় করিতেছে। একটু বিস্মিত হইয়া আমার একজন নূতন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ইনি বিধবা হইয়া স্বয়ং মৎস্য ক্রয় করিতেছেন কেন?' আমার নবপরিচিত বন্ধুটি হাসিয়া বলিলেন—'বিড়ালের জন্য'। আমি কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে রাখালবাবু, আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি, বলিলেন,—ঐ শ্রেণীর বিধবারা মৎস্যাহারী। তবে লোক-লজ্জার ভয়ে বাড়ীতে এক একটা বিড়াল পুষিয়া রাখে।

নরেশ বলিল,—বেশ—বা বেশ' রাখাল। তা'হলে তোমার সাগরেদ রাখালচন্দ্র কাজ করছেন মন্দ নয়। কিন্তু এখনও কাজের কথাতো কিছু বা'র করতে পার্‌ছে না।

আমি বলিলাম,—আরও একটু মিশুক। আমি তাকে বলে দিয়েছি যে, সে অবনীর সঙ্গে মিশে বন্ধুত্ব করবে। ক্রমে ক্রমে তার বিশ্বাসী হ'য়ে তবে তো কাজের কথা বা'র করবে। আর অবনীও কিছু কাঁচা ছেলে নয় যে একজন অপরিচিতের কাছে আপনার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করবে। দেখছি স্বয়ং আমাকে কাশী যাত্রা করতে হ'বে।

আচ্ছা তা' হবে, এখন পড়, পত্রের শেষটা পড়।

আমি আবার পড়িতে লাগিলাম।—"পোড়া দেশের লোক এ সকল নৈতিক অবনতি দেখিয়া নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছে, এ গুলা সমাজের কলঙ্ক তাহা স্বীকার করিতেছে; কিন্তু তাহাদের সম্মুখে একবার বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব কর দেখি। অমনি দেখিবে যে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য মহামহা অখণ্ড শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাহারা তোমায় বুঝাইয়া দিবে যে পত্যন্তর গ্রহণ শুধু বিধবার পক্ষে মহাপাপ, তাহা নহে। ইহা সমস্ত সমাজকে গভীর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। এ সমাজকে আবার মান্য করিতে হয়"।—

নরেশ বাধা দিয়া বলিল,—তাই সমাজের মস্তকে পদাঘাত ক'রে প্রণয়িনীকে নিয়ে পলায়ন করা বুদ্ধিমান যুবকের মহাধর্ম্ম।

নরেশ যেরূপ মুখভঙ্গি করিয়া কথাগুলা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল, তাহাতে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যের কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়াই আবার পড়িতে লাগিলাম।

"এইরূপ জ্ঞানশূন্য সমাজের মাথামুণ্ডহীন নিয়মের বশে আমাদের থাকিতে হয়।

"ভয় হয় পাছে আবার নিজের প্রসঙ্গের মধ্যে পড়ি। মুরলার প্রসঙ্গ নিজের প্রসঙ্গ নহে। তবু মুরলার কথা একটির অধিক বলিব না। ২৭শে শ্রাবণ মুরলার বিবাহ।"

মিঃ সেন আবার বাধা দিয়া বলিল,—"আজ ২৬শে শ্রাবণ।"

আমি তাহা জানিতাম। একবার প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। আমি আবার পড়িতে লাগিলাম,—তাহার বিবাহের সন্নিকটবর্ত্তী এই কয়টা দিন বালিকা কি সুখে কি এক অপরিচিত পুলকময় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে,—তাহা তো তুমি নিজেই উপলব্ধি করিতে পার।

"পত্রখানা বড় বৃহৎ হইল। যেমন থাক একখণ্ড পত্র দিও। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো।

"স্নেহের অবনী।"

পত্র পাঠ শেষ হইলে আমরা উভয়েই কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিলাম। নরেশ একটু সচিন্তভাবে বলিল—সবই ফাঁকা। বিশেষ তো কিছু বুঝতে পারা গেল না। যাক্ রাখালকে কি রকম পত্র দিয়েছ বল দেখি।

আমি বলিলাম—এতক্ষণ সে আমার পত্র পেয়েছে। এই দুইদিন কোনও ক্রমেই সে অবনীর সঙ্গ ছাড়া হবে না। কাল যখন বিবাহ তখন নিশ্চয়ই বালিকাকে কাল কাশী নিয়ে যাবে, কিংবা অবনী তার কাছে আস্‌বে। কোনও প্রকারের সংবাদ

পেলেই সে আমাদের টেলিগ্রাফ করবে। পুলিশের ভয় দেখিয়ে হ'ক, যেমন করে হ'ক বিবাহ বন্ধ রাখবে, আর পারে তো বালিকাটাকে জোর ক'রে দখল করবে। তা হলেই আমরা সময় থাকতে তাকে হস্তগত ক'রে শীতলপ্রসাদের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিব।

নরেশ হাসিয়া বলিল,—আর সুরেন্দ্র বাবুর কাছ থেকে বখ্‌সিস্ নিয়ে প্রতিভার পরিচয় দিব।

এবার আমি বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হইলাম। এ বুদ্ধি তাহার। তাহার পর আমাদের এই প্রকার অপ্রতিভ করিয়া রাস্তায় বসাইয়া শেষে বিদ্রূপ করিতে লাগিল—তাহার এ আচরণটা আমার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। কোনও একটা ওজর করিয়া বিবাহের দিনটা পিছাইয়া লইতে আমি পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্র বাবুকে পরামর্শ দিতেছিলাম। কিন্তু আমার বুদ্ধিমান অংশীদার আমাকে তাহা করিতে দেন নাই। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া রীতিমত বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। বরপক্ষ তাহার আড়ম্বর দেখিয়া কোনও সন্দেহ করে নাই। যাহার জন্য এত আয়োজন, যাহার বিবাহের জন্য এই সকল বন্দোবস্ত হইতেছিল, প্রকৃত পক্ষে সে জীবিত আছে কি না তাহাও কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না। অথচ গম্ভীরভাবে স্বপ্নরাজ্যের বালিকার শুভ উদ্বাহের জন্য পৃথিবীতে নানা প্রকার ব্যবস্থা হইতেছিল। এতবড় পাগলামি, এ হেন অসম্ভব ব্যাপার আমি জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। আজ শীতলপ্রসাদের কলিকাতায় আসিবার দিন ছিল। যদি কোনও প্রকারে তাহার মনে ঘুণাক্ষরে একটা সন্দেহ

উপস্থিত হয়, যদি সে একবার রহস্য বুঝিতে পারে, তাহা হইলে কিরূপ ভীষণ একটা কলঙ্কের কথা হইবে, কি একটা তুমুল কাণ্ড বাধিবে তাহা ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। শুধু তাহাই নহে। ইহা হইতে প্রতারণার ফৌজদারী মামলা উপস্থিত হইতে পারে। আর কে জানে যে, এই আন্দোলনে আমাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে। ভবিষ্যতে এ ব্যবসায় দ্বারা যে অর্থোপার্জ্জন করা অসম্ভব হইবে শুধু তাহাই নহে। হয় ত তাহার প্রতারণায় সাহায্য করা অপরাধে নরেশচন্দ্রকেও সুরেন্দ্র বাবুর সহিত একত্র আসামী হইতে হইবে। আমি স্পষ্ট করিয়া এ সকল কথা প্রথমে নরেশকে পরে সুরেন্দ্র বাবুকেও বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম। কিন্তু এ কয়দিন কোনও প্রকারেই তাহারা আমার উপদেশমত কার্য্য করিল না। সুরেন্দ্রনাথকে নরেশ কি একটা বৃথা আশায় নাচাইতেছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সেটা কিসের আশা তাহা ঠিক বুঝিলাম না।

যখন এতটা গণ্ডগোলের স্রষ্টা হইয়া সে উদাসভাবে আমাকে বিদ্রূপ করিল এবং শেষে নির্লজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিল যে, আজ রাখালের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ না আসিলে কি হইবে, তখন ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি তাহাকে যথেচ্ছা গালি দিলাম। সে অম্লানবদনে সেগুলাকে উদরস্থ করিয়া বলিল —"ও সব রাগের কথা ছেড়ে দাও না, ভাই। যা হ'য়ে গেছে তার উপর তো আর কারও হাত নেই। আর কপাল ছাড়া পথ কোথায়? এখন বল দেখি কি করা যায়?"

আমি বলিলাম,—যদি কাল লগ্নের মধ্যে কন্যা না পাই, তা' হ'লে তোমার গোঁফ কামিয়ে তোমাকে ক'নে সাজিয়ে বিয়ে দেবো। এই আমার পরামর্শ!

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিষাদক্লিষ্ট কষ্টলাঞ্ছিত মুখ দেখিয়া বড় দয়া হইত। সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—কি মশাই, দুই বখরাদারে মিলে কি বাদানুবাদ কর্‌ছেন?

আমি সপ্রতিভভাবে বলিলাম—না কিছু না। তার পর কি অভিপ্রায়?

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—অভিপ্রায় আপাততঃ কাল রাত্রে মহাশয়দের জলপানের নিমন্ত্রণ করা। আপনারা আমার বড় বেশী বন্ধু। নেহাৎ যেন ঠিক বিবাহের সময় গিয়ে হাজির হবেন না। একটু আগে এসে দেখা শুনা করবেন।

নরেশ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—লগ্ন কখন?

সুরেন বলিল,—তা সকাল সকাল। রাত্রি ৯॥• টার সময়।

আমি দেখিলাম, উভয়েই ক্ষেপিয়াছে। নির্ব্বাক্ হইয়া তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাখালের সংবাদ

তখন মাত্র রাত্রি দশটা বাজিয়াছিল। স্থির হইয়া শয্যায় শুইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। বলা বাহুল্য, পাঠে আদৌ মন-সন্নিবেশ করিতে পারিতেছিলাম না। আর কেমন করিয়াই বা পারিব ? নিশাবসানে সেই কাল ২০শে শ্রাবণ, বিবাহের দিন। আর ২৪ ঘণ্টায় মধ্যেই আমার বুদ্ধিমান সহচরের মত্ততা এক গভীর শোকের কারণ হইয়া উঠিবে। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম তাহা পাইলাম। রাখালের নিকট হইতে একখানি টেলিগ্রাফ আসিল।

টেলিগ্রাফখানা হস্তে পড়িবামাত্র সজোরে হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। কি জানি তাহার মধ্যে কি লিখিত আছে ? কম্পিত-হস্তে ধীরে ধীরে লেফাফাটি ছিঁড়িয়া পাঠ করিলাম—Nothing unusual James as before myself with him always for two days. No sign of Flora অর্থাৎ কিছুই অসাধারণ নহে। জেমস্ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, আমি দুইদিন ধরিয়া অনবরত তাহার সহিত রহিয়াছি, ফ্লোরার কোনও চিহ্ন নাই। সংবাদটা আমার মোটেই ভাল লাগিল না। প্রেরকের নাম দেখিলাম (Joseph) জোসেফ। কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত বলিয়াই তো বোধ হইল। আমার মানসিক উত্তেজনার অবস্থাটা কাটিয়া গেল, তাহার স্থলে

হৃদয় জুড়িয়া এক বিরাট অবসাদ আসিয়া আমাকে একেবারে নির্জ্জীব করিয়া তুলিল।

আমি পূর্ব্বাপর বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের শত্রুপক্ষ খুব প্রবল ও বুদ্ধিমান। সুতরাং প্রতি পদে আমি সতর্কতা অবলম্বন করিতেছিলাম। টেলিগ্রাফে অবনী, মুরলা বা রাখালের নিজের নাম ব্যবহৃত হইলে কোনও প্রকারে তাহা যদি শত্রু পক্ষের হস্তে পঁহুছায় তাহা হইলে সকল শ্রম পণ্ড হইবে! ইহা ভাবিয়া তাই তাহার নিজের নামের পরিবর্ত্তে Joseph, মুরলার পরিবর্ত্তে Flora এবং অবনীর পরিবর্ত্তে James শব্দ ব্যবহার করিতে রাখালকে উপদেশ দিয়াছিলাম।

নিরাশার প্রথম মোহটা কাটিয়া যাইবার পর বিচার করিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম, প্রথমেই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, টেলিগ্রাফখানা প্রকৃত রাখালের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে কি না। তাহা যে প্রকৃত সে সম্বন্ধে প্রথমে কোনও সন্দেহ হইল না। প্রথমতঃ আমরা যে বিষয়ের তদন্ত হস্তে লইয়াছি বা রাখাল যে আমাদের লোক তাহা অবনীর জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ জেমস্ ফ্লোরা প্রভৃতি সাঙ্কেতিক কথাগুলো শত্রু পক্ষের নিকট অবিদিত। সুতরাং তাহারা আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ঐ জাল টেলিগ্রাফখানি পাঠাইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তে অভ্রান্তভাবে পঁহুছিতে পারিলাম না।

তাহার পরে ধারণার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি-তর্ক ছিল তাহা লইয়া যখন মনের মধ্যে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলাম,

তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, রাখালের নামের মদ্‌লিখিত একখানা পত্র হস্তগত করিতে পারিলেই তো শত্রুপক্ষের নিকট আমাদের সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ২৫শে শ্রাবণ অবনীর পত্রখানা আমার হস্তগত হয়। সেই পত্র হইতে জানিতে পারি যে, ২৭শে শ্রাবণ মুরলার বিবাহ হইবে। যাহারই সহিত হউক অবনী-প্রদত্ত সংবাদ হইতে তাহার বিবাহের তারিখটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াই রাখালকে উপরোক্ত পরামর্শ দিয়া পত্র দিই। কিন্তু জেম্‌স্‌, ফ্লোরা প্রভৃতি কথাগুলা টেলিগ্রাফে ব্যবহার করিবার জন্য সেই পত্রে উপদেশ দিয়াছিলাম কি না, তাহা ঠিক স্মরণ করিতে পারিলাম না। যদি সেই পত্রে ঐ কথাগুলা থাকে আর যদি সেই পত্রখানা অবনীর হস্তগত হইয়া থাকে তাহা হইলে সে যে আমার মত নির্ব্বোধকে প্রতারিত করিবার জন্য এরূপ তারের সংবাদ প্রেরণ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। অন্ততঃ আমাদিগের বিরক্তিকর অনুসরণের হস্ত হইতে শান্তি পাইবার জন্য তাহার পক্ষে এরূপ একটা সংবাদ প্রেরণ করা মোটেই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল না। প্রকৃতই যদি সংবাদটা রাখালের নিকট হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে মুরলার হইল কি ? অবনীর পত্র হইতে নির্দ্ধারিতরূপে কোনও কথা প্রমাণিত না হইলেও বেশ বুঝা যাইতেছিল যে, একটা কিছু নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিয়া, একটা উচ্চ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া সে বিবেকের কষাঘাত সহ্য করিতেছিল। মুরলাকে অপহরণ করা

ব্যতীত নীতিবিগর্হিত কার্য্যটা যে অপর কিছু হইতে পারে তাহা তো আমি কল্পনা করিতে পারিলাম না। শেষে কোনও সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারিলাম না। শারীরিক ও মানসিক অবসাদটা ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর শান্তিময় অঙ্কে বিশ্রাম লইলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন

প্রভাতে উঠিয়াই স্মরণ হইল, আজ ২৭শে শ্রাবণ—বিবাহের দিন। বিবাহ-দিবসের সে মেঘমুক্ত প্রভাতের নব অনুরাগপূর্ণ সানাইয়ের ভৈরবী ধ্বনিতে প্রাণ মন শীতল হইল না। অরুণোদয়ের সহিত একটা ভীষণ আতঙ্ক আসিয়া হৃদয়াধিকার করিল। শয্যা ছাড়িতে পারিলাম না। শয্যায় শুইয়াই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

ভাবিলাম অনেক কথা। নিজের জীবনে নানা অঘটন ঘটিয়াছিল, নানা কারণে কত নিদ্রাহীন নিশি অতিবাহিত করিয়াছিলাম, কত দিন কত উৎকণ্ঠা, কত আবেগ, কত প্রতীক্ষা, কত আশা লইয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ যে উৎকণ্ঠায় যে আতঙ্কে শয্যা ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম সেরূপ উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক ইতিপূর্ব্বে আর কখনও জানি নাই। আজ পরের ভাবনা ভাবিয়া, পরের অনিষ্ট আশঙ্কায় হৃদয়ে বড় ধিক্কার উপস্থিত হইল। কেন মিছামিছি সামান্য শক্তি

লইয়া একটা অজ্ঞ, দায়িত্বশূন্য স্বার্থপর যুবককে অংশীদার করিয়া এ দুরূহ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম? উদরান্ন-সংস্থানের জন্য তাহাই যদি করিলাম তবে আপনাদের শক্তি বুঝিয়া ছোট খাট তদন্ত হস্তে লইয়া কেন ক্ষান্ত হইলাম না? যে সকল জটিল রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা আমাদিগের সাধ্যাতীত, সে সকল কার্য্যে ব্রতী হইয়া বৃথা ধৃষ্টতা করিলাম কেন? গভীর মর্ম্মপীড়ায় অধীর হইয়া তখন মনে করিলাম, কেন সুরেন্দ্র বাবুকে সময়ে আপনাদিগের অসামর্থ্যের কথা জ্ঞাপন করি নাই! তাহা হইলে দুইটী ব্রাহ্মণ পরিবারের সুখ পাদপের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইত না। বড়ই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। কেন তখন নরেশের আশ্বাস-বাক্যে ভুলিয়া ভদ্রলোকের একটা সর্ব্বনাশের কারণ হইলাম?

কবি ও উপন্যাসলেখকগণ আশা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন সে গুলির অর্থ যথার্থ অনুভব করিলাম। বাস্তবিকই আশা কুহকিনী, আশা অমৃতভাষিণী, বাস্তবিক আশা দায়িত্বশূন্যা উদাসিনী। আবার সময়ে সেই আশাই আত্মস্তরী মায়াবিনীর মত আমাদের হৃদয়ের সুখের তারগুলা স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে উৎফুল্ল করে। এতটা বিষাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে আশা হইতেছিল যে, এখনও রাখালের নিকট হইতে শুভ সংবাদ আসিতে পারে।

শয্যা ছাড়িয়া সে দিন প্রাতঃকালে আর কোথাও বাহির হইলাম না। নরেশ প্রভাতেই কোথা গিয়াছিল। বেলা প্রায়

দশটার সময় সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহার দায়িত্ব-শূন্য বদনে চিন্তার কোনও রেখাই ছিল না। তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধূম পান করিতে লাগিলাম। নরেশ বলিল,—কিহে, এতটা গাম্ভীর্য্যের অর্থ কি ?

আমি উদাস ভাবে বলিলাম,—জীবনে গোটাকতক ভুল করেছি তার জন্য অনুতাপ করছি।

"কি কি ভুল ?"

"প্রথম ভুল পুলিস বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করা। দ্বিতীয়তঃ চাকুরি যাইবার পর তাহা আবার পাইবার চেষ্টা না করা। তৃতীয় ভুল এই ডিটেক্‌টিভের পেশা গ্রহণ করা এবং চতুর্থতঃ"— "আমাকে অংশীদার গ্রহণ করা। বাস্তবিক এটা মস্ত ভুল। আমার চৌদ্দ পুরুষে কেহ কখনও এ টিক্‌টিকির ব্যবসায় অবলম্বন করে নাই।"

"ঠিক তাই। পঞ্চম ভুল হ'চ্ছে সুরেন্দ্র বাবুর জটিল রহস্য-পূর্ণ তদন্তটা হাতে লওয়া, তার পর ভুল একেবারে অবনীর অনুসরণ না করা"—

ঠিক সেই সময়ে আমাদিগের অফিসের দারবান আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাহা খুলিয়া দেখিলাম উহাতে লিখিত আছে—"Left for Calcutta with James, reaching evening.

নরেশ বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমিও ততোধিক বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। টেলি-

গ্রামটা কিন্তু হৃদয়ে অনেক নূতন আশার সৃষ্টি করিল। কি যেন যাদুবলে জড়তা কাটিয়া গেল। আবার দুই বন্ধুতে মিলিয়া অনেক কল্পনা করিলাম। কিন্তু অবনীর কলিকাতায় আসিবার প্রকৃত কারণ কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

শেষে বিরক্ত হইয়া নরেশ বলিল,—বাবা, বুঝি না। আর ও বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হ'বে? যা হ'বার তা' হবেই। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটে কা'রও বোঝবার ক্ষমতা নেই। এখন এস, স্নানাহার ক'রে একটু দাবা খেলতে বসা যাক।

আমি দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা সমীচীন যুক্তি আর থাকিতে পারে না। নিজেদের চেষ্টায় তো এ মামলাটার বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। সুতরাং স্থির হইয়া ঘটনাস্রোত অবলোকন ভিন্ন আর তো কিছুই করিতে পারিব বলিয়া মনে হইল না।

আমি বলিলাম,—হাঁ, তা খেল্‌ব। তা বলে একেবারে নিশ্চেষ্ট হওয়া কিছু না। তারা বোধ হয় বোম্বাই মেলে আস্‌বে।

নরেশ বলিল—আবার কি একটা মতলব করছ?

আমি বলিলাম—না, মতলব কিছু না। তবে বিকেলে একবার ষ্টেসনটায় যেতে হবে। অবনী কোন দিকে যায়, কি ক'রে, সে সবগুলা ঠিক ক'রে খবর নিতে হবে।

নরেশ হাসিয়া বলিল,—হাঁ সেই বোম্বাই মেলের জনস্রোতের মধ্যে তুমি সেই যুবক অবনীকে বেছে নেবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—মূর্খ, তার সঙ্গে যে রাখাল থাক্‌বে।

প্রতিজ্ঞামত আহারাদির পর নরেশের সহিত দাবা খেলিতে আরম্ভ করিলাম। সাধারণতঃ এ ক্রীড়ায় তাহার অপেক্ষা আমার পারদর্শিতা অধিক হইলেও সে দিন তাহার নিকট তিন বাজী হারিলাম। প্রথম বাজিতেই আমার অসাবধানতা বশতঃ সে একটা বোড়ের দ্বারা আমার মন্ত্রীমহাশয়ের প্রাণনাশ করিল; তাহার পর এক দান প্রায় সবলে মাত হইলাম। তৃতীয় দফায় তো একেবারে সে আমায় অশ্বচক্রের জোগাড়ে ফেলিয়াছিল। শেষে বহু কষ্টে মানটা বাঁচাইলাম।

পাঁচ ঘটিকার সময় হাবড়া ষ্টেশনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

নরেশ বলিল,—বাঃ, তুমি বুঝি সুরেন্দ্র বাবুর বাটীর নিমন্ত্রণটা রক্ষা করবে না?

"আরে যাও। তুমি তার মুরুব্বি, তুমি যেও।"

"না, না রাগের কথা নয়। ভদ্রলোক বিপদে পড়বেন। চরম সময় একটা কিছু মিথ্যা ফন্দি করে তাঁকে বাঁচাতে হবে।"

"আচ্ছা! আমি তো অবনীর সন্ধানে যাই। এখনও আশা আছে, মুরলাকে লগ্নের মধ্যে পাইতে পারি। যদি রাত্রে ৯টার মধ্যে আমি না ফিরি, তাহা হইলে বালিকার কলেরা হইয়াছে বা তাহার প্লেগ হইয়াছে এইরূপ একটা কিছু বলিয়া বিবাহটা বন্ধ করিও। আর যদি তাহা না পার তবে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিও। বরপক্ষীয় লোকেরা প্রাণের দায়ে পলাইবে। আর নেহাত অতটা না পার, তাহা হইলে পশ্চাতের দরজা দিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে পলাইতে বলিও।"

আমি যতক্ষণ কথা কহিতেছিলাম, আমার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া নরেশ হাসিতেছিল। আমার শেষ প্রস্তাবটা শুনিয়া সে অনুমোদন করিল।

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ, মতলবটা ভাল বটে কিন্তু তোমার পক্ষে ততটা ইষ্টকর নহে! সে সময় বড় একটা সুরেন্দ্রবাবুর সম্মুখে থাকিও না; কারণ নিরাশার উত্তেজনায় তাঁহার পক্ষে তোমার গলায় ছুরি বসাইয়া দেওয়া বড় অসম্ভব নহে। বুঝিতেই তো পার যে, তাঁহার অদ্য রাত্রের এই নূতন সর্ব্বনাশের কারণ তোমার অপরিণত দায়িত্বশূন্য বুদ্ধি।

"ঠিক বলেছ। আর বরপক্ষের লোকগুলাও ক্ষেপে একটা তুমুল কাণ্ড বাধাতে পারে। যা' হ'ক, নারায়ণ যা করেন তাই হ'বে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমস্যা

অতি দম্ভে ভীষণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাষ্পীয় শকট হাবড়ার প্ল্যাটফরমে আসিয়া পৌছিল। দীর্ঘকাল আবদ্ধ ক্লান্ত নরনারী আবার স্বাধীনতা লাভ করিবার আশায় উত্তেজিত হইয়া সুবিধামত গাড়ীর গবাক্ষ দিয়া বাহিরে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিল। নীল কোর্ত্তা-পরিহিত কুলিগুলা গাড়ীর হাতল ধরিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল, কোন্ গাড়ীতে বেশী মোট আছে। বাহিরে ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ানগুলা ষ্টেসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া অশ্বের লাগাম ঠিক করিয়া লইল। ডাক.গাড়ীর বাবু একবার জৃম্ভণ করিয়া কার্য্যের জন্য সতর্ক হইলেন। ইংরাজী হোটেলের কতকগুলা ভৃত্য প্রথম শ্রেণী হইতে বিদেশী সাহেব সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ হোটেলে লইয়া যাইবার জন্য প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা পোষাক-গুলা ঝাড়িয়া ভদ্রলোকের মত আকৃতি করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। যাহারা আত্মীয় বন্ধুর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে আসিয়াছিল, তাহারা সাগ্রহে গাড়ীর আরোহিবৃন্দকে দেখিতে লাগিল। ষ্টেশন মাষ্টার ছুটিল, টিকিট কালেক্টর ছুটিল, ভিড়ের মধ্যে দুই একটা পকেটমারা মিশিয়া গেল, আমার মত দুই একজন ছদ্মবেশী গোয়েন্দা কোন্ না সেই গোলমালে যোগদান করিল! আমি যাহা খুঁজিতে ছিলাম তাহা পাইলাম। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে রাখাল ও তাহার সুন্দর-শ্রী যুবাপুরুষ অবনীকে দেখিলাম।

তাহাদিগের হাবড়া পৌছিবার প্রথম উত্তেজনাটা কাটিয়া গেলে আমি ঘুরিতে ঘুরিতে যেন অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছি এইরূপ ভান করিলাম। রাখালকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—বাঃ, রাখালবাবু যে। হঠাৎ কলিকাতায় কোথা হ'তে?

রাখালবাবুও মদসদৃশ বিস্ময় দেখাইয়া বলিল—"বাঃ! সতীশবাবু কোথা থেকে? আমার কলিকাতায় আসাটা হঠাৎ হ'ল বটে।"

আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, একটি আত্মীয়ের আগমন-প্রতীক্ষায় ষ্টেসনে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ সে ট্রেণে তিনি আসেন নাই। তাহার পর তাহাকে অকস্মাৎ কলিকাতায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

রাখাল বলিল,—কারণ কি তা জানি না। এই ভদ্রলোকটি আমার বন্ধু। যশোহর জেলার ইনি একজন বেশ সম্ভ্রান্ত জমিদার।

আমি অবনী বাবুর দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাস্য করিলাম। অবনীবাবু বেশ সুমার্জ্জিত যুবকের মত একটু হাস্য করিয়া আমায় নমস্কার করিলেন। আমিও নমস্কার করিলাম। পরে উভয়ে করমর্দ্দন করিলাম। ইতিমধ্যে রাখাল আমার পরিচয় দিল,—"বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

আমি বলিলাম,—কত দিন আপনাদের এ স্থলে থাকা হ'বে?

অবনী রাখালের দিকে চাহিয়া বলিল,—কিছুই জানি না। হঠাৎ এসেছি হঠাৎ যাব।

গল্প করিতে করিতে সকলে বাহিরে আসিলাম। অবনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—অবনী বাবু, এখন কোথা যাবেন?

অবনী হাসিয়া বলিল,—তাহাও এক প্রকার অনিশ্চিত ছিল। বর্দ্ধমানে আসিয়া স্থির করিলাম যে, বহুবাজারে হেমন্ত বাবু নামক এক বন্ধুর বাটীতে যাব।

আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম,—আচ্ছা, তবে আপনারা যান। আমি চললাম।

একটু অমায়িক ভাবে হাসিয়া অবনী বলিল,—মহাশয়, আমাদের আসল 'মিশন'টা শুন্‌লেন না? আমাদের যশোরের বাটির ঠিক পার্শ্বেই একটি ভদ্রলোক বাস করেন। আজ তাঁর কন্যার বিবাহ। তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন। আমার গোমস্তা সেই পত্রখানা কাশীতে আমার নিকট পাঠিয়ে দেয়। তাই নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌বার জন্য এসেছি। রাখাল বাবুকে পাকড়াও ক'রে আনলাম।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। তবে কি যুবক একেবারে নির্দ্দোষ? না, তাহা নয়। বোধ হয় সুরেন্দ্র বাবুর অসমসাহসিক ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যুবক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। আর এরূপ আগমনে তাহার উপর হইতে সন্দেহটা অপনোদিত হইবে,—অবনী তাহাও বুঝিয়াছে। উঃ—তাহা হইলে এই সুঠামবপু প্রশস্ত-ললাট সুশ্রী যুবকটী কি ভয়ঙ্কর লোক! তাহার হৃদয়ে বেশ উত্তেজনার ভাব রহিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা গেল। আবার সন্দেহ হইল! জগতে অর্থ-বলই শ্রেষ্ঠ বল। রাখাল তো বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই?

আমি বলিলাম,—বাঃ, আপনার সৌজন্য আদর্শ। ভদ্রলোকটি বোধ হয় আপনাদের পরিবারের পুরাতন বন্ধু।

রাখাল হাসিয়া বলিল,—না, না। সুরেন্দ্র বাবুকে অবনী বাবু মাত্র এক বৎসর জানেন।

আমি—কে সুরেন্দ্র বাবু ?

রাখাল—যাঁহার কন্যার বিবাহ।

আমি—সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার ?

অবনী (সাগ্রহে)—হ্যাঁ, আপনি তাঁকে জানেন নাকি ?

আমি—খুব জানি। আমারও তো সেখানে নিমন্ত্রণ, এখনি যেতে হবে।

অবনী—বাঃ, তবে তো সঙ্গী জুটে গেল। আমি পোষাক বদ্‌লেই সেখানে যাব।

রাখালকে অন্তরালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিছু বুঝতে পারলে ?

রাখাল বলিল,—কিছু না। আমি সঙ্গ ছাড়বো না। ঠিক সুরেন্দ্র বাবুর বাটী গিয়ে হাজির হচ্চি।

রাখালকে একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলাম। মনে হইল তাহার উপর আমার সন্দেহটা ভিত্তিহীন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ-বাসর

তাহারা গাড়ীতে উঠিল। আমি একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে চড়িয়া সুরেন্দ্র বাবুর বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এমন রহস্য আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। যাহাকে ধরিবার জন্য এই মাসাবধি নানা কল্পনা নানা আড়ম্বর

করিতেছিলাম, এত দিনের অনুসন্ধানের পর, যাহার উপরে সন্দেহটা বেশ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, যাহাকে ধরিতে পারিলে এ জটিল রহস্যের মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হইতেছিল, আজ সহসা সেই ব্যক্তি যেন আমাদের সিদ্ধান্তগুলার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য সশরীরে আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হইল! শুধু তাহাই নহে, এত বড় একটা ভীষণ অপরাধ করিয়া লোকে পৃথিবীর মধ্যে যেস্থলে যাইতে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় পায়, যে সকল ব্যক্তির নিকট স্বভাবতঃ মুখ দেখাইতে চাহে না, যুবক ঠিক সেই স্থলে সেই রূপ ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য বেনারস হইতে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। অবনী এ ব্যাপারে নির্দ্দোষ হইলে তো আমাদের তদন্ত আবার নূতন করিয়া অপর দিক হইতে করিতে হইবে। আর প্রকৃত দোষী হইলে তাহার ভণ্ডামীর মুখোস উন্মোচন করিয়া তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করা বা সুরেন্দ্র বাবুর কন্যা উদ্ধার করা আমাদের মত ডিটেকটিভের সাধ্যাতীত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না। কতকগুলা প্রশ্ন বড় রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন—অবনী অকস্মাৎ কলিকাতায় আসিল কেন?

অবনীর কলিকাতায় আসিবার কথাটা তাহার নির্দ্দোষিতা বা দোষিতার সমভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রথমতঃ যদি মনে করা যায় যে, অবনী নির্দ্দোষ, তাহা হইলে—কেবল মাত্র তাহার এই সময়ে কলিকাতা আগমনটাই তাহার নির্দ্দোষিতার বেশ স্পষ্ট প্রমাণ।

প্রতিবাসীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিবার ছলে ব্যর্থপ্রণয়-বিদগ্ধ মনের আবেগে যৌবনসুলভ "রোম্যান্টিক" ভাবের উত্তেজনায় সে স্বয়ং তাহার ভালবাসার পাত্রী মুরলার অপর যুবকের সহিত বিবাহ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে, এবিষয়ে মোটেই অসমীচীনতা বা অস্বাভাবিকতা ছিল না। তাহার আকৃতি দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, যুবক তেজস্বী ও বলবান। অথচ সে যে একটা প্রবল সংগ্রাম হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেছিল—তাহা তাহার মত নিরাশ প্রেমিকের পক্ষে অসাধারণ নহে। তাহাকে দোষী বলিয়া লইলেও তাহার পক্ষে অকস্মাৎ কলিকাতা আগমনটাও সে মতের বিরোধী নহে। যাহাতে তাহার উপর কোনও রূপ সন্দেহ না হয় সে চেষ্টা তো তাহার মত কৃতবিদ্য ও চতুর ব্যক্তি করিবেই। আপনাকে সন্দেহমুক্ত করিতে হইলে কন্যাপহরণ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা ব্যতীত আর বিশিষ্ট উপায় কি হইতে পারে? সাধারণতঃ লোকে বুঝিবে যে, যে ব্যক্তি এরূপ একটা গুরুতর অপরাধে লিপ্ত, তাহার পক্ষে এমন সপ্রতিভভাবে সুদূর কাশীধাম হইতে এত দূর আসিতে পারা অসম্ভব। তাহার উপর যদি প্রকৃতই মুরলা তাহার আয়ত্তাধীন থাকে, তাহা হইলে মুরলার কলিকাতায় বিবাহ হইবে এরূপ হেঁয়ালীপূর্ণ সমাচারটার অর্থ কি—তাহা জানিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা জন্মিবারই কথা। তাহার মুখের ভাবও তাহার দোষিতার এক উত্তম নিদর্শন। সুতরাং এই সব সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে যখন সুরেন্দ্র বাবুর বাসার গলির মোড়ে পৌঁছিলাম, তখন সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আমি

একটি বিরাট মূর্খ, আমার দ্বারা এ রহস্যের মীমাংসা প্রত্যাশা করা বৃথা। সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। তখন নহবৎওয়ালারা সানাই বাঁশীতে গৌরীর তান ধরিয়াছে। তাহার সহিত ঠেকা মন্দিরা চলিতেছে। সমস্তই যেন বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দেবদারুপাতা, নারিকেলের ডাল ও পতাকাদি-বিভূষিত নহবতের মঞ্চটি বেশ সুসজ্জিত। প্রবেশ-দ্বারে আসিটিলিন গ্যাসের আলোকের দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লেখা "স্বাগতঃ।" গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে নামিবার মুখে বিলাতী মসলিনের কার্টেন যবনিকা। অঙ্গনটি বড় সুচারুরূপে সজ্জিত। আমাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ এই সুদৃশ্য অঙ্গনটি প্রকৃত বিবাহ আসর হইলে কি সুখের হইত! উঠানের উপর চন্দ্রাতপের নিম্নে নানাবর্ণের বড় বড় জাহাজী নিশান ঝুলিতেছিল। দশডালের একটি সুন্দর বেলোয়ারি স্ফটিক ঝাড় সেই প্রমোদশালার শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। চারিদিকে নানা বর্ণের বেললণ্ঠন ঝুলিতেছিল। উঠানের চারিদিকে গোটাকতক আসিটিলিন গ্যাস প্রদীপ প্রকৃত পক্ষে আসরটিকে আলোকিত করিতেছিল—মোমবাতির দীপগুলা কেবল শোভাসম্পাদন করিতেছিল মাত্র। উঠানের উপর সারি বাঁধিয়া বেন্টউডের শূন্য চেয়ার বরযাত্রীদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বরের বসিবার আসন প্রতিষ্ঠিত। কুসুম-সজ্জিত সেই বিলাস-সিংহাসন দেখিয়া আমার অংশীদারের উপর বড় রাগ হইল। একখানি নানা সুন্দর

উপকরণ-বিভূষিত চতুর্দ্দোলা বরের সিংহাসনরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। বরের বসিবার প্রশস্ত চৌকীখানি ভেলভেট মণ্ডিত ও সুকোমল। সেই বর বসিবার আসনটির চতুর্দ্দিকে বড় বড় গাছ চিনা মাটির টবে শোভা পাইতেছিল। সে স্থলের শিল্পের ও স্বভাবের সংমিশ্রণটা বেশ নয়নরঞ্জনই হইয়াছিল। তাহার পর পার্শ্ব-স্থিত একটা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সে গৃহটিও বেশ সু-সজ্জিত। ভূমির উপর বেশ ভাল জয়পুরী কার্পেট, গৃহপ্রাচীরে দেওয়ালগিরি—কার্পেটের উপর গোটাকতক হুকার বৈঠক। বুঝিলাম বয়স্ক কর্ত্তৃস্থানীয় বরযাত্রীদিগের জন্য এই গৃহটি সজ্জিত হইয়াছে।

নহবৎ থামিল। পল্লীর দুই একটা বালক চেয়ারের সারির ভিতর দিয়া সর্পের মত বক্রগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের আনন্দ চীৎকার ব্যতীত এই সুসজ্জিত হলে সকলই নিস্তব্ধ, সকলই নিঝুম,—ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে সেইরূপ গম্ভীর। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম ৭টা ১৫ মিনিট হইয়াছে।

আমি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এমন সময় কার্য্যকরী সভার সভ্য নরেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পোষাক দেখিয়া আমার হাসি আসিল। নগ্ন পদ, গাত্রে একটি গেঞ্জি এবং গলায় এক খানা মোটা তোয়ালে। আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সসম্ভ্রমে জোড়হস্তে বলিল—"আসুন, আসুন, সতীশবাবু। ওরে, তামাক দে।"

তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া রাগও হইল, হাসিও পাইল। তাহাকে বলিলাম, "ঐ তোয়ালে গলায় জড়াইয়া মর।" সে

হাসিয়া বলিল—"আরে, ভাই, বোঝ না, বরযাত্রদের খাবার আয়োজনটা ক'রে রাখা উচিত।" প্রথমে তাদের খাইয়ে সন্তুষ্ট ক'রে বিদায় করব, তারপর যে কটা লোক থাকে তাদের বোঝা যাবে। বিবাহ-রাত্রের আয়োজনের জন্য শীতলপ্রসাদ বাবু আবার াঁচ শত টাকা দিয়েছেন।"

আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সুরেন্দ্র বাবু আসিলেন। আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু হ'য়েছে নাকি? আপনি যখন এত বিলম্বে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু সুবিধা হ'য়েছে। আর তো ঘণ্টা দেড়েকের মামলা।" আমি শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলাম,—"এখনও আশা আছে নাকি?" "আশা শেষ অবধি ছাড়ব না। চরম সময় যা মনে আছে তা করব।"

আমরা তিনজনে তিনটে থেলো হুঁকা লইয়া চেয়ারে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। আমরা সেই অবস্থায় কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় সুরেন্দ্র বাবুর পুত্র রমেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—বাবা! বাবা! অবনীবাবু এসেছেন!

সুরেন্দ্র বাবু ও নরেশ বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি একটু হাসিলাম। বালক রমেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে সেও কম বিস্মিত হয় নাই। প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া গেলে সুরেন্দ্র বাবু স্বয়ং তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

নরেশ বলিল,—ব্যাপারটা কি?

আমি বলিলাম,—বাহাদুরী আছে। কিছু বুঝিবার সাধ্য নেই।

সুরেন্দ্র বাবু সৌজন্য প্রকাশ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন। পশ্চাতে অবনী, হেমন্ত ও রাখাল। আমার দিকে চাহিয়া অবনী বলিল,—"সতীশ বাবু, কতক্ষণ?"

অব ার নিকট আমি পরিচিত, ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রবাবু ও নরেশ বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম,—"এই অল্প ক্ষণ। তার পর, হেমন্ত ভায়া যে! তোমার দাদার খবর কি?" এরূপ স্থলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় হেমন্ত একটু অপ্রতিভ হইল।

অবনী ব্যগ্রভাবে বলিল,—সুরেন্দ্রবাবু, হেমন্ত ও রাখাল বাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। নেহাত একেলা আসব ব'লে এঁদের সঙ্গে এনেছি। নিমন্ত্রণটা এইখানেই করুন।

সুরেন্দ্রবাবু ভদ্রতা প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের আগমনে তিনি আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিলেন। আমি ও নরেশ তাহাদের বিনা নিমন্ত্রণে আগমন অবশ্য অনুমোদন করিলাম। উৎসাহ পাইয়া হেমন্ত বলিল—আমি ওসব লৌকিকতার ধার ধারি না। জানি ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাটীতে এলে কিছু অপরাধ করে না।

অবনী বলিল—সুরেন্দ্রবাবু, সামান্য উপহার এনেছি, একটা লোক পাঠিয়ে দিন না গাড়ি থেকে নিয়ে আসুক।

উপহারগুলি দেখিয়া সকলেই অবনীর রুচির সুখ্যাতি করিলাম। উপহার অপর কিছুই নহে—একখানি মূল্যবান্ বেনারসী সাড়ি ও এক চুবড়ি গোলাপ ফুল। নরেশ আমাকে জনান্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তাইতো হে, ব্যাপারটা কি

বল দেখি? এমন ধীর ও বুদ্ধিমান চোর কখনও দেখি নি।" "আমার কিন্তু বোধ হ'চ্চে যে লোকটা নির্দ্দোষ। দোষী ব্যক্তির ভাবগতিক চালচলন এতটা ধীর হ'ত্তেই পারে না।" "ও তাহ'লে তোমাকেও ঠকিয়েছে?" "না—অবনীর নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসটা ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছে। তোমার মনে নাই যে লোকটা নব্যভাবে শিক্ষিত এবং প্রেমিক। নিজের হৃদয়ের সুকোমল বাসনা সাফল্য লাভ করিল না সুতরাং নিজের মূর্ত্তিময়ী আশা পরহস্তে চলিয়া যাইতেছে এ দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখা একটা বড় রোমান্টিক ভাব। ইহার নজীর আছে অনেক বাঙ্গালা ও ইংরাজী নভেলে। আর হেমন্তকে ডাকিয়া আনিয়াছে নিজের প্রণয়িনীর ফুল্ল নলিনী সদৃশ মুখখানি দেখাইয়া আপনার রুচির পরিচয় দিবার জন্য। না, আমার শেষ সন্দেহটুকু অপসারিত হইয়াছে, আমাদের তদন্ত এবার অন্য দিক দিয়া করিতে হইবে।"

ছেলে মহলে বড় একটা গোলযোগ পড়িয়া গেল। সকলে ছুটিয়া বাহিরে গেল! দূর হইতে মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি আসিয়া তাহাদিগকে এইরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল। একটা মহা কোলাহল উঠিল—"বর আসিতেছে, বর আসিতেছে।" সুরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ দ্বারের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খ-নাদ করিতে লাগিলেন। সকলের সহিত আমিও বাহিরে গেলাম। গলির দুইদিকের গবাক্ষগুলিতে কুলবধূরা বর দেখিতে আসিল।

ক্রমে মিছিল সন্নিকটবর্ত্তী হইল। দুইদিকে এসিটিলিন গ্যাসের ল্যাম্পের সারি, তাহার মধ্যে যত জনমানব। প্রথমেই

একদল দেশীয় ঢুলি ঢোল ঢাক প্রভৃতি বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। তাহাদিগের দলে যে ছোকরাটি কাঁসি বাজাইতেছিল তাহারই পারদর্শিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইল; কারণ সেই কর্কশ শব্দের মধ্যে তাহার যন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কলরব করিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে একদল রসনচৌকী। তাহাদেরও বাদ্যে বিশেষ শ্রুতি-মধুর শব্দ কিছু পাইলাম না। তাহার পর একটা চতুষ্কোণ কাপড়ের যবনিকার উপর হইতে দুইটা বিচিত্র বেশ পরিহিত লম্বা শ্মশ্রুবিশিষ্ট মৃত্তিকার বাউল দৃষ্টিপথে পড়িল। তাহারা বালকবালিকা ও আমোদপ্রিয় নরনারীর হর্ষোৎপাদন করিবার জন্য নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছিল। তাহাদের সহিত তালে তালে ঢোল বাজিতেছিল। তাহার পশ্চাতে একখানা গো শকটের উপর বাঁশ ও কাগজ নির্ম্মিত একখানা জাহাজ। তাহার উপর দুইটা কুৎসিত বালক কদর্য্যাকার নাবিকের পোষাক পরিধান করিয়া নানা প্রকার মুখ ভঙ্গী করিতেছিল। তাহার পশ্চাতে ঐরূপ একখানি গোযানের উপরস্থিত বাঁশের ও কাগজের ময়ূরকণ্ঠী নৌকায় দাঁড়াইয়া একটা কুরূপা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান স্ত্রীলোক অতি কুৎসিতভাবে নাচিতেছিল। নৌকার পশ্চাতে ইংরেজী বাদ্য—তাহাও অতি কর্কশ। তাহার পর বাঁশ ও কাগজের একটা হিমালয় পর্ব্বত—দুইটা কুলি বহন করিয়া আনিতেছে। পাহাড়ের উপর মহাদেবের মূর্ত্তি। একটা সাপ সেই হিমালয়ের উপর উঠিতেছিল। সাপটার কলেবর হিমালয়ের সমান। মনে মনে ভাবিলাম—আমাদের দেশের ইতরশ্রেণীর শিল্পীদিগের কৃতিত্ব

অসামান্য। একদল মাদ্রাজী বাদ্যকারের পশ্চাতে জুড়ি ঘোড়ার গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। পাত্রটির বয়স আন্দাজ কুড়ি বছর হইবে; তাহার বর্ণ বেশ গৌর,—মুখখানি অতি কোমল। কিন্তু শরীর তেমন বলিষ্ঠ ও সুগঠিত বলিয়া বোধ হইল না।

সভায় বর বসিলে কোলাহলের মধ্যে আমি গিয়া গোপনে অবনীর পশ্চাদ্ভাগে বসিলাম। সে ও হেমন্ত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল; সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহই আমাকে লক্ষ্য করিল না।

হেমন্ত বলিল—"বরটির কতদূর বিদ্যা? অবনী একটু হাসিয়া বলিল—বার দুই এণ্ট্রান্স ফেল হয়েছিল। তবে নাকি বাপের অনেক পয়সা আছে।" "ছোক্‌রাকে দেখ্‌লে ভাগ্যবান বলে বোধ হয়।" "সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে?"

তাহার পর সাধারণ প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। সেখানে বড় সুবিধা করিতে পারিব না ভাবিয়া রাখালকে কোন রকমে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। রাখাল কোন কথাই বলিতে পারিল না। তাহারও বিশ্বাস—অবনী নির্দ্দোষ।

রাত্রি ৯৷৷• বাজিল। লগ্ন উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু সভায় আসিয়া বরকে বিবাহস্থলে লইয়া যাইবার জন্য শীতলপ্রসাদ বাবুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পাত্র ভিতরে দালানের উপর বসিল। বরপক্ষীয় জনকয়েক ব্যক্তি ভিতরে গেল। আমিও গেলাম। আমার পশ্চাতে হেমন্ত ও অবনী বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিবাহের কার্য্য আরম্ভ হইল। উত্তেজনায় আমার হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিলাম

—এইবার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইবে—আমোদ প্রমোদ বিস্ময়ে পরিণত হইবে। কন্যা আনিবার সময় হইল। আমার উত্তেজনার অবধি রহিল না। সম্প্রদানের জন্য কন্যা আসিল। সেই বিবাহ বাসরের আলোকে দেখিলাম, কন্যা অপর কেহই নহে মুরলা। চোখ মুছিয়া দেখিলাম—মুরলা। নিকটে সরিয়া গিয়া দেখিলাম —মুরলা। আমার স্বর্গীয় পিতামহ যদি আবার নরদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেন তাহা হইলেও আমার বিস্ময়ের মাত্রাটা এত অধিক হইত না। সেই ফটোগ্রাফের চিত্রটাকে একমাস কাল দিবানিশি ধ্যান করিয়াছি। সুতরাং জীবন্ত মুরলা যেন আমার কতদিনের পরিচিতা। ফটোগ্রাফের মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির কোনও প্রভেদ ছিল না। দেখিবামাত্র চিনিলাম যে সর্ব্বসুলক্ষণা কুসুমরূপা সেই কিশোরীটি—মুরলা।

হেমন্ত চুপি চুপি অবনীকে বলিল—"বাঃ! বাঃ! বড় সুন্দর চেহারাটা তো।" অবনী বলিল—"একমাসে কিন্তু একটু রোগা হ'যে গেছে।" তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

পিছন হইতে কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। ফিরিয়া দেখিলাম। স্মিতমুখে নরেশ। সে আমাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার পিছুপিছু চলিলাম। আজ সে বিজয়-গর্ব্বিত, আমি নির্ব্বোধ। জনান্তিকে গিয়া হাসিয়া বন্ধু বলিল—"ক'নে দেখ্‌লে?" আমি বলিলাম—"তুমি ভোজবাজী জান। ক'নে পেলে কোথা? ও ঠিক মুরলা তো?" নরেশ হাসিয়া বলিল—"কেন ফটো দেখ নি? ঐ রূপসীই—মুরলা।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বামী নিগ্রহে

এ সকল পুরাতন কথা। বিবাহের পর জানিলাম, আমাদের সুরেন্দ্রবাবুর মোকদ্দমার সহিত এ সব কথার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তাই মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলাম। অনেক বেশী কথা শুনিয়াছিলাম। আমি সংক্ষেপে সে কাহিনী বিবৃত করিব।

দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের সহিত স্থিতিশীল হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার চালচলন একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই এ কথা যাঁহারা বলিয়া বেড়ান—আমার বিশ্বাস তাঁহারা আমাদের সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। পাশ্চাত্যের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া কেবল পোষাক পরিচ্ছদে কথাবার্ত্তায় আমাদের অবস্থান্তর ঘটে নাই। অনেক স্থলে আমাদের ভাবের বেশ একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। যে সকল পরিবারে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেই সকল পরিবার-মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে লোপ পাইয়াছে! বহুবিবাহ প্রধানতঃ কৌলীন্য প্রথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৌলীন্য প্রথারও মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। আবার কৌলীন্যপ্রথার আশীর্ব্বাদে

বঙ্গদেশে গৃহ-জামাতার সংখ্যা যেরূপ অধিক ছিল, কৌলীন্য প্রথার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে জামাতা প্রতিপালন করিবার পদ্ধতিও ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শিক্ষা বিস্তারের সহিত লোকের মনে আত্মমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া শ্বশুর গৃহে প্রতিপালিত হইতে এখন আর কেহ সহজে স্বীকৃত হয় না। এমন কি সামান্য ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াও যাহারা শ্বশুর গৃহে বাস করে তাহারা নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য ও হীন প্রকৃতির লোক—এ ধারণাটা দেশের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক কতকটা ঐরূপ ভাবের উত্তেজনায় জীবনধন মুখোপাধ্যায় ধনী শ্বশুর নীলমণি গাঙ্গুলির গৃহ পরিত্যাগ করে। সমগ্র বিষ্ণুপুরে তখন নীলমণি গাঙ্গুলির প্রতাপ অখণ্ড ছিল। দুর্ব্বিনীত ব্রাহ্মণ প্রজা অবাধ্য হইলে তাহার ব্রহ্মোত্তর অপহরণ করিয়া তাহা বাধ্য ও চাটুকার আত্মীয়কে দান করিতে থানার উদ্ধত দারোগার নামে নালিসের পর নালিস রুজু করিয়া, ভারতেশ্বরীর সর্ব্বশক্তিমান্ পুলিশের উপর অবধি আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে, আশপাশের জমিদার, পত্তনিদার প্রভৃতির সহিত সামান্য কথায় কোমর বাঁধিয়া দেওয়ানী ফৌজদারী দুই চারি নম্বর মামলা করিতে নীলমণির মত দক্ষতা কাহারও ছিল না। এমন কি বিষ্ণুপুরের রাজারাও নীলমণিকে দুর্জ্জন ভাবিয়া দূরে পরিহার করিতেন—কখনও তাহার বৈরিতাচরণ করিতেন না।

তাহার জামাতা জীবনধন বর্দ্ধমানের ইংরাজী বিদ্যালয়ে

শিক্ষালাভ করিয়াছিল, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কেবল দারিদ্র পীড়িত হইয়া সে ধনী নিলমণি গাঙ্গুলীর গৃহজামাতা হইয়াছিল। তাহার অপর কিছু কষ্ট ছিল না। কষ্ট ছিল মনের। একজন অত্যাচারী লোকের গলগ্রহ হইয়া থাকা, তাহার উৎপীড়নে স্থির থাকিয়া তাহার কার্য্য অনুমোদন করা জীবনের পক্ষে বড় কষ্টের কারণ হইয়া উঠিতেছিল। শ্বশুর গৃহে স্বচ্ছন্দে বাস করা অপেক্ষা স্বোপার্জ্জন-লব্ধ অন্নে জীর্ণ কুটীরে বাস করা প্রকৃতপক্ষে সুখকর। জীবন দরিদ্র ও নিঃসহায় হইলেও সময়ে সময়ে শ্বশুরের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিল। বিবাহের অল্পদিন পরেই শ্বশুর ও জামাতার মনোমালিন্য ঘটিল।

বলা বাহুল্য শ্বশুরের সহিত অনৈক্য বশতঃ গৃহজামাতা-জীবনধনই হারি মানিলেন। এত বড় বিশাল পৃথিবীতে আপনার বলিতে জীবনধনের কেহও ছিল না। যে আত্মীয়দিগের গৃহে জীবন প্রতিপালিত হইয়াছিল। এখন তাহারাও আর তাঁহাকে পরিবার মধ্যে ফিরিয়া লইতে সম্মত হইল না। একেতো বাহিরের লোককে অন্নদান করা বিশেষ সুখকর কার্য্য নহে; তাহার উপর জীবনকে গৃহে লইয়া নীলমণির সহিত দ্বন্দ্ব করিবার ভরসা তাহাদের মোটেই ছিল না! এতদিন তাহারা জীবনকে অন্নদান করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়া ধনী গৃহে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। সামান্য মানুষে আর কি করিতে পারে? বিশেষ এই কলিকালে। তাহারা ও একপ্রকার দায়মুক্তও

হইয়াছিল। নীলমণির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং যখন জীবন ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিল যে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া শ্বশুর গৃহে বাস করা অকীর্ত্তিকর, জঘন্য ব্যাপার, তখন ত্রস্ত বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া তাহারা জীবনকে অনেক সুপরামর্শ দিয়াছিল। তাহারা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। যাহাকে অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া সংসারে বাস করিতে হয় তাহার পক্ষেতো একটা বাহিরের আশ্রয় ভিন্ন জীবনধারণ করাই দুরূহ ব্যাপার। শ্বশুর এবং পিতায় প্রভেদ কি? শ্বশুরের কথায় রুষ্ট হইয়া সে ঠিক বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করে নাই। আর অমন শ্বশুর! যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমস্ত দেশটা বিকম্পিত, বাঘে গরুতে এক পাত্রে জল খায়। তাহার কথায় আবার রাগ, তাহার সহিত আবার মনান্তর! এসব একালের শিক্ষার দোষ। এখনই জীবনের পক্ষে তাহার শ্বশুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এরূপ অবস্থায় যুবক জীবনধন কি করিতে পারে? অনন্যোপায় হইয়া, শ্বশুরের চালচলন কথাবার্ত্তার উপর দন্তস্ফুট করিতে পারিল না। আবার শ্বশুরগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শ্বশুরও বিচক্ষণ ব্যক্তি, সংসারের কীট। মানবচরিত্রের দৌর্ব্বল্য অধ্যয়ন করা তাহার একটা প্রধান কার্য্য। নীলু গাঙ্গুলি মনে মনে বুঝিল যে জামাতার মেজাজ কড়া। তাহার গর্ব্বে পদাঘাত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। অথচ সেকালের শিক্ষা ও সামাজিক

আদব কায়দা-অনুসারে তাহার প্রতি মৌখিক ভালবাসা দেখাইতে বিরত হইল না। আর এ বিদ্যায় তাহার শ্বশুরও বিশেষ দক্ষ ছিল। নীলমণি যেদিন কাহারও উপর মিথ্যা ডিক্রী লইয়া তাহাকে সপরিবারে পূর্ব্ব পুরুষের বাস্তু ভিটা হইতে বেদখল করিয়া ভিখারী করিত, সেদিন প্রাতঃকালে তাহার বাটী গিয়া কুশল জানিয়া আসিত, সম্মানযোগ্য ব্যক্তি হইলে তাহার আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিত এবং বয়ঃ-কনিষ্ঠ বা শূদ্র হইলে তাহাকে অম্লান বদনে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিত। সুতরাং সে বাহিরে জীবন-ধনের উপর মৌখিক স্নেহ প্রদর্শন করিত এবং সুবিধা পাইলেই তাহার গর্ব্বে আঘাত করিয়া তাহাকে ব্যথিত করিত।

বুদ্ধিমান জীবনধন কিন্তু নীলমণির হৃদয়ের প্রকৃত ভাবটা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে হৃদয়ঙ্গম করিল যে বেশী দিন তাহার আশ্রয়ে থাকিলে তাহাকে আপনার মানসম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়া অনুগ্রহজীবীর মত থাকিতে হইবে আর আপনার আত্মমর্য্যাদা রাখিয়া চলিলে কোন্‌দিন তাহাকে শ্বশুরের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমাকে ভালবাসিলেও, আপনার হৃদয়ের বিষ উদ্গিরণ করিবার সময় নীলমণি স্নেহ প্রভৃতি দুর্ব্বল রমণী-সুলভ বৃত্তির দ্বারা বশীভূত হইবে না, জীবনধন এ সিদ্ধান্তও করিয়াছিল। সে বড়ই মানসিক কষ্টে এক বৎসর অতিবাহিত করিল।

জীবনধন যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল তাহাতে কলিকাতা বা অপর সহরে গিয়া বাস করিলে কোনও প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন

করিতে পারিত। তাহার পক্ষে আপনার পরিশ্রমলব্ধ শাকান্ন যে শ্বশুরগৃহের চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় অপেক্ষা উপাদেয় হইবে, নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভরণপোষণের জন্য দিবানিশি পরিশ্রম করিয়াও যে সে ধনীর অনুগ্রহজীবী হইয়া সচ্ছন্দতাভোগ করা অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইবে, তাহা ভাবিয়া সে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে নিষ্ঠুর নীলমণির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহার এ সঙ্কল্পের প্রধান অন্তরায় ছিল মনোরমার স্নেহ—তাহার যুবতী ভার্য্যার অকৃত্রিম নির্ম্মল ভালবাসা। তাহার নিকট বিদেশ যাইবার কথা উত্থাপন করিলেই মনোরমা স্বামীর হাত ধরিয়া কাঁদিত, তাহার অবমান-সন্তপ্ত বক্ষস্থলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পবিত্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করিত। তাহাতে জীবনধনের হৃদয়ের ক্ষতস্থল ধৌত হইয়া মুছিয়া যাইত, সেও কাঁদিত, শেষে হাসিত, রজনীর অবশিষ্ট ভাগ প্রমোদে কাটিয়া যাইত।

নীলমণি যে পরিমাণে নির্দ্দয় ও কঠোর ছিল, যুবতী মনোরমা ঠিক সেই পরিমাণে কোমল ও মধুর প্রকৃতির ছিল। স্বভাবে এরূপ বৈপরীত্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা জগদীশ্বরের সৃষ্টি মাহাত্ম্য।

ধীরে ধীরে যেমন মনোরমার জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছিল সে ক্রমশঃ নিষ্ঠুর পিতার ব্যবহার গুলার বিসদৃশতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছিল। স্বামীর উপর পিতাকে অত্যাচার করিতে দেখিয়া যুবতী প্রাণের মধ্যে বড় যন্ত্রণা ভোগ করিত। যে দিন

তাহার স্বামী স্বাধীন হইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল সে দিন মনোরমা অবাধে আপন জীবন প্রদীপকে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিল।

শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করিবার সময় জীবন ও মনোরমা কিরূপে পরস্পরের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কাঁদিয়াছিল, মনোরমার স্নেহময়ী জননী স্বামীর ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিলেও গোপনে জামাতাকে কিরূপ আশীর্ব্বাদের সহিত কিঞ্চিৎ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন, নিঃসহায় গৃহজামাতার বিদেশে অর্থো-পার্জ্জন করিতে যাইবার সাধ হইয়াছে দেখিয়া পাপিষ্ঠ নীলমণি কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিল এ সকল কথা আমি বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে পারি না কারণ সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা, তাহার পর বৎসরে মোটে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ সকলই যে ঘটিয়াছিল তাহা আমি স্বয়ং জীবনধন বাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম! তাহার বিদায়ের সময় জীবনধন মনোরমার সহিত একটা মহা সর্ত্ত করিয়া-ছিল। সে রোরুদ্যমানা স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছিল —"প্রিয়তমে, আমি যতশীঘ্র পারি আসিয়া তোমায় লইয়া যাইব। আমার কষ্টের দিনে অপরিচিত সংসারে তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী হইতে পারিবে কি ?" তাহাতে মনোরমা বলিয়াছিল,— "আমায় এখনি লইয়া চল, যেখানে তুমি থাকিবে সেই স্থানই আমার স্বর্গ।" কিন্তু অতটা দুঃসাহস জীবন দেখাইতে পারে নাই। সে একাকী জীবনার্ণবে ভাসিয়া পড়িয়াছিল।

নিঃসহায় অবস্থায় বন্ধু-হীন জীবনধন কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রথমে বিষম বিপদজালে জড়িত হইয়াছিল একথা সহজেই অনুমেয়। নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন একে একে মাথা তুলিয়া তাহার গন্তব্য পথের মধ্যে বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু এ সকল বিপদে, এত কষ্টের মধ্যেও সে একটা স্বাধীনতার সঞ্জীবনী প্রভাবে হৃদয়ে অপার আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল। বৎসরের পরে তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, একটি ভদ্রলোক তাহার উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এলাহাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি বণিক। তাঁহারই কার্য্য এক বৎসর কাল করিয়া একদিন জীবনধন অকস্মাৎ এলাহাবাদ হইতে বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপনীত হইল।

বিষ্ণুপুর ত্যাগ করিবার পর এ দুইবৎসর জীবনধন কাহাকেও পত্রাদি দিত না। তাহার বিরহ-বিধুরা সাধ্বী স্ত্রী প্রবাসী স্বামীর সংবাদ পাইবার জন্য কত আকাঙ্ক্ষা করিত। জীবনধনের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা জানিত না। নীলমণির স্ত্রী মধ্যে মধ্যে স্বামীকে জামাতার সংবাদ লইবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু নীলমণি সে কথায় কর্ণপাত করিত না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অচিরেই বীতগর্ব্ব হইয়া দৈন্য-পীড়িত জীবনধনকে আবার তাহার আশ্রয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু যখন এক বৎসর অতিক্রম করিল তখন স্ত্রীর প্ররোচনায় সে একবার জামাতার সন্ধান লইতে চেষ্টা করিল। বলা বাহুল্য তখন জীবন এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছিল

সুতরাং কেহ তাহার সংবাদ দিতে পারিল না। এ অপরাধটা জীবনেরই ইহা ভাবিয়া নীলমণি জামাতার উপর অধিকতর রাগান্বিত হইল। দুইবৎসর পরে জীবন দেশে ফিরিল, তখন সকলেই বিস্মিত হইল, সকলেই তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল; কিন্তু শ্বশুর নীলমণি আনন্দের লেশমাত্র না দেখাইয়া বরং মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখাইল।

স্বদেশে পৌঁছিয়া জীবন প্রথমেই আপনার আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল। যাহারা তাহাকে অন্নদানে প্রতিপালিত করিয়াছিল, জীবন দুই বৎসরে যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রদান করিল। শ্বশুরের সহিত কলহ করিয়া বিষ্ণুপুর ত্যাগ করিবার জন্য যাহারা জীবনের উপর একটু কুপিত হইয়াছিল তাহারা সকলেই এখন বুঝিল যে জীবন আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নীলমণির নিকট হইতে বিদায় লইয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছিল।

জীবনধন যে কয়দিন বিষ্ণুপুরে বাস বাস করিল তাহার মধ্যে স্ত্রীর সহিত একটা রফারফিত হইয়া গেল। যে প্রকারেই হউক সে স্ত্রীকে লইয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গিনী করিবে। এ বিষয়ে জীবনধনের বিশেষ আগ্রহাতিশয্য না থাকিলেও স্নেহময়ী মনোরমার কাতরতায় তাহাকে এ দুরূহ সঙ্কল্পে সম্মত হইতে হইয়াছিল। দুই চারিদিন ইতস্ততঃ করিয়া একদিন ধীরে ধীরে শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবন বলিল—"যদি অনুমতি করেন তো আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাই।"

জামাতার কথা শুনিয়া নীলমণি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। যে সকল অবমাননাকর কথা কহিয়া তিনি জামাতাকে কাঁদাইলেন তাহা শুনিয়া তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা অনুপমার ক্ষুদ্র হৃদয়ও পিতার প্রতি ক্রোধে ভরিয়া গেল। সে ছুটিয়া মনোরমার নিকটে গিয়া বলিল—"দিদি জামাই বাবু তোকে বিদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।" মনোরমা হাসিয়া বলিল—"কেন।" গম্ভীরভাবে বালিকা বলিল—"বা, দিদি! না সত্যি করে বল্—তোরও ইচ্ছা আছে?"

মনোরমা কথাটা বুঝিতে পারিল না—বলিল—"কেন?" বালিকা জ্যেষ্ঠার নিকট ভগ্নীপতির অপমানের কথাটা বলিল। সে সময় অনুপমা পিতার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সে জীবনধনের চক্ষু হইতে জল পড়িতে স্পষ্ট দেখিয়াছে। এ সংবাদে কি পতি-প্রাণা মনোরমার চক্ষু শুষ্ক থাকিতে পারে? যুবতী কাঁদিল। দক্ষগৃহে শিবানী যেমন কাঁদিয়াছিলেন সেইরূপ কাঁদিল।

বালিকা অনুপমা বলিল—"ছিঃ দিদি কাঁদছিস্ কেন? তুই আজই রাত্রে জামাই বাবুর সঙ্গে পালা। আমার বিয়ে হ'লে আমিও পালাতাম। এখানে আর থাকিস্ না।" মনোরমা তখন ছোট ভগ্নিটিকে বক্ষে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"বটে!" কিন্তু সেই কথাটা তাহার মস্তিষ্কে ঘুরিতে লাগিল। পিতৃ-ভক্তি, মাতৃ-ভক্তি, স্বদেশ-প্রীতি, লোক-লজ্জার ভয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মনোরমা স্বামীর সহিত পলাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন গৃহে

পথে নারী বিবর্জ্জিতা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যুবক জীবনধন যুবতী ভার্য্যা সমভিব্যাহারে কর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে বড় বিশেষ কষ্ট পায় নাই। নিজের সামান্য অবস্থানুসারে মনোরমার সুখ-স্বচ্ছন্দের বিধান করিতে জীবনধন বড় নূতন সুখ পাইয়াছিল। মনোরমার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়টি কিন্তু বিষাদে ভরিয়া রহিল। পিতার নিকট হইতে মনের আবেগে চলিয়া আসিবার সময় সে বুঝে নাই যে, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিষ্ঠুর পিতাও অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার মাতাকে দেখিতে না পাইলে তাহার পক্ষে প্রাণ ধারণ করা এরূপ দুরূহ হইবে তাহা সে পূর্ব্বে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। ছোট ভগ্নী অনুপমার জন্যও তাহার হৃদয় কাঁদিত। তাহার উপর সেই গ্রামের পথ, ঘাট, তরু, লতা সকলই যেন কি মন্ত্র-বলে তাহার হৃদয়কে পিত্রালয়ের দিকে টানিতে আরম্ভ করিল। রাত্রিতে যুবতী স্বগৃহের স্বপ্ন দেখিত—অনুর সেই অর্থহীন প্রগল্ভতা তাহার কর্ণকুহরে দূরস্থিত সঙ্গীত-ধ্বনির মত ঝঙ্কৃত হইত।

কিন্তু স্বামীর মনে কষ্ট হইবে বলিয়া মনোরমা একদিনের তরেও জীবনধনকে একথা বলে নাই। বুদ্ধিমান জীবন বুঝিয়াছিল তাহার প্রেমে স্ত্রী কতটা স্বার্থত্যাগ করিয়াছে। শেষে দুই বৎসর পরে যখন তাহাদের প্রথম শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, তখন

মনোরমার মনটা এক প্রকার স্থির হইল। এখন তাহার জন্ম নূতন পৃথিবী সৃষ্ট হইল। যদিও একটা অব্যক্ত বাসনা চিরদিন তাহাকে সেই গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া যাইত তবু সে বাসনার আর সেরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল না। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। আমাদের নূতন নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া চলিবার ক্ষমতা ভগবান দেন বলিয়া এখনও পৃথিবী জীবপূর্ণ।

চঞ্চলা কমলা। প্রথমে তিনি জীবনধনকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তখন জীবনধন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিত। জীবনধন ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল, পশ্চিমের বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, পাঁচ জনের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হইল। মনোরমা চারিটি সুকুমার প্রসব করিলেন। দুঃখের পর সুখ—কুহেলিকার পর অরুণ-কিরণ—বড় মিষ্ট, বড় সুখের। চারি পুত্রের পর এক কন্যা জন্মিল। জীবনধন বড় শান্তিতে বড় তৃপ্তিতে প্রায় বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিল।

চঞ্চলা কমলা ভ্রূকুটি করিলেন, একটু অন্যমনস্কতার ভাব—একটু যেন অশান্তি প্রকাশ করিলেন। জীবনধনের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কাল-কবলিত হইল। সাজান বাগানে বজ্রাঘাত হইল, বড় তরুটি জ্বলিয়া গেল। জীবনধন বাল্যের কুহেলিকার ছায়া দেখিল। তাহার পর আর একটি, তাহার পর আর একটি,

শেষে চতুর্থটি। একে একে পিতামাতাকে হাসাইতে হাসাইতে তাহারা যেমন আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি একটির পর একটি জনক-জননীকে কাঁদাইয়া ফিরিল! জীবনধন কত চেষ্টা করিল প্রথমটির মৃত্যুর পর দুইজনে অবশিষ্ট কয়েকটিকে টানিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু যম ভীষণ শত্রু। বাকি রহিল অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা সরলা—রূপের আকর, জ্যোৎস্নার রাণী, অমৃতভাষিণী সুন্দরী সরলা। স্নেহময়ী সরলার উপর পিতা-মাতার যত স্নেহ, যত মমতা কেন্দ্রীভূত হইল। সৌভাগ্যময়ী বালিকা হাসিত, খেলিত, ছুটিত। শিশু-কণ্ঠে বৃদ্ধার মত কত বড় বড় কথা বলিত। পিতা মাতার মুখে যে সব কথা শুনিত, পুত্তলিকা-দম্পতির হইয়া নিজে সে সব কথা আবৃত্তি করিত। জীবনধন শুনিত, মনোরমা শুনিত। উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিত,--কি অপার আনন্দ! একটিতে এত সুখ দান করে, বাকি গুলি থাকিলে আজ ধরণী স্বর্গ হইত। তাহারা বোধ হয় অনেক পাপ করিয়াছিল, তাহাদের বোধ হয় ভগবান শাস্তি দিতে চাহেন; আরও যদি শাস্তি দেন! তাহারা সরলার মুখের দিকে চাহিত—কি লাবণ্য! তাহারা শিহরিয়া উঠিত। বালি-কাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইত, মুখচুম্বন করিত। সে বুঝিত না। তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া পুতুলের সংসারে গিয়া গৃহিণীপণা করিত।

আরও পাঁচ বৎসরের সংগ্রাম—ভাঙ্গা বুক লইয়া লড়াই। জীবনধন এখন আর সে রকম সাফল্য লাভ করে না। বালি-

জ্যের লক্ষ্মীও চাঞ্চল্য দেখাইল। জীবনধনের আর সে উদ্যম, সে অধ্যবসায় ছিল না আর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে জীবন সুখ পায় না। এখনও তাহার যথেষ্ট অর্থ ছিল। মাত্র একটা কন্যা। তাহাকে যথেষ্ট যৌতুক দান করিয়াও বক্রী সম্পত্তিতে তাহারা মনের সুখে থাকিতে পারিবে। কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, এই ত্রয়োদশ বর্ষের স্নেহের কেন্দ্রস্থল গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। কি বিড়ম্বনা! কি নির্জ্জনতার ছায়া! সংসার তখন কেমন লাগিবে কে জানে? যে সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে সে যৌবনে বিদ্রোহ-কেতন উড়াইয়াছিল এখন সেই রীতি বড় মঙ্গলময় বলিয়া প্রতিভাত হইল। একটি শান্ত শিষ্ট গৃহ-জামাতা মিলে না? তাহাদের পুত্র নাই। জামাতা মিলে না? জামাতা পুত্রের স্থানাধিকার করিবে, কন্যা গৃহে থাকিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আগন্তুক

বাগান বাটীর বারান্দায় বসিয়া জীবন ও মনোরমা গল্প করিতেছিল। বালিকা একখানা আরাম-চৌকিতে বসিয়া পড়িতেছিল। বহুদিন তাহারা বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়াছে। সরলা কলিকাতা এই প্রথম দেখিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এই বাগান-বাটীতে তাহারা বাস করিতেছিল। সহরে বড় গোলমাল!

বাঙ্গালীর মেয়ের উপযুক্ত বর পশ্চিমে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে না থাকিলে তাহারা সরলার জন্য মনের মত পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিবে না বলিয়া জীবনধন ও মনোরমা বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়াছিল। সরলা বুঝিয়াছিল তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে। সে একটু গম্ভীর হইয়াছিল। বাপ মার উপর রাগ করিয়াছিল। অথচ প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা নূতন ভাব, একটা নূতন আশা জাগিয়া উঠিত।

বলিয়াছি, জীবনধন ও মনোরমা গল্প করিতেছিল, বালিকা পড়িতেছিল। গাছপালা বর্ষার জলে স্নান করিয়া বেশ সবুজ দেখাইতেছিল। হঠাৎ দুইটা লোক বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া একটা আমগাছের পার্শ্বে দাঁড়াইল। বালিকার দিকে চাহিয়া তাহারা কি একটা পরামর্শ করিতেছিল। জীবনধনের নিকট ব্যাপারটা ভাল বলিয়া বোধ হইল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পিছনের দরজা দিয়া তাহাদের পশ্চাতে একটা গাছের ঝোপে দাঁড়াইল। লোক দুইটি এত একাগ্রতার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল যে তাহারা মোটেই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। জীবনধন মন দিয়া তাহাদের কথোকথন শুনিতে লাগিল।

যুবকটি বলিল—"মহাশয় আমি আজ প্রায় এক মাস ধরে ফটোখানা দেখছি, এতটা কি আর ভুল করব।" বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল—মশায় এ না। যুবক কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—"কি বলেন মশায়! আপনার চোখ্ খারাপ হয়েছে,—নিশ্চয় চোখ্ খারাপ হয়েছে।" এই চোখ্ মুছে দিলাম, দেখুন দেখি।

যাত্রা-থিয়েটারের শ্রীকৃষ্ণ দিব্যচক্ষু দান করিবার সময় যেমন অভিনেতার চক্ষে হাত বুলাইয়া দেয়, যুবকটি সেইরূপ প্রৌঢ়কে দিব্য-চক্ষু দান করিল। জীবনধন ঠিক করিতে পারিল না—আগন্তুকদ্বয় পাগল না বদ্‌মায়েস। বোধ হয় পাগল। দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ় বলিল—"হাঁ, মুরলার মতনই বটে।" যুবক বলিল—"সুরেন্দ্র বাবু বলেন কি! মুরলাকে চিন্‌তে পারলেন না।" সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ অনেকটা তার মতন বটে তবে একটু রোগা আর যেন ইঞ্চি খানেক তার চেয়ে বেঁটে।" যুবক বলিল—"কি বিপদ! নিশ্চয় মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। একমাস চোরের আড্ডায় থেকে মেয়েটা রোগা হবে না?" জীবনধন ভাবিল—ব্যাপার মন্দ না। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"মিঃ সেন। ঠিক হয়েছে। মুরলা বটে। তবে—" মিঃ সেন বলিল—"তবে আবার কি? মাথা খারাপ হয়েছে, মাথা খারাপ হয়েছে। এমন বাপ তো দেখিনি। বাপ হ'য়ে নিজের মেয়ে চিন্‌তে পারেন না? ঘোর কলিকাল। ঘোর কলিকাল!" জীবনধনের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না, তাহা না হইলে, তাহারই বাগানে দাঁড়াইয়া একটা জুয়াচোর বোধ হয় কিছু লাভ করিবার জন্য অপর লোককে বুঝাইতেছে যে সরলা তাহার কন্যা। যুবক যাহাকে সুরেন্দ্র বাবু বলিতেছিল, তিনি বেশ আনন্দ বোধ করিতে-ছিলেন; অথচ তাঁহার প্রাণে একটা ভয় হইতেছিল—যদি তাঁহার ধারণা ভুল হয়, যদি বালিকা বাস্তবিক অপরের কন্যা হয়। মিঃ সেনের কিন্তু কোন সন্দেহ ছিল না। সে পকেট হইতে এক খানা

ফটোগ্রাফ বাহির করিল। জীবনধন দেখিল তাহা সরলারই ফটোগ্রাফ। কি বিপদ, জুয়াচোরটা কোন সময় তাহার কন্যার ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। যুবক বলিল,—"সুরেন্দ্র বাবু আর কি—কেল্লা মেরে দিয়েছি,—আপনি এক কাজ করুন দেখি। আপনি, একটু এগিয়ে যান। মুরলা আপনাকে দেখেই ছুটে আসবে এখন। আমি পুলিস্ থেকে লোক-জন ডাক্‌চি।" জীবনধন দেখিল, এ প্রহসন ক্রমে বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছে। যতক্ষণ কেবল পাগল দুইটা থাকে এক রকম পরিত্রাণ আছে। কিন্তু পুলিশের শুভাগমন হইলে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিবে। আর এ ব্যাপার অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া হইবে না।

তাহারা বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। জীবনধন তাহাদের অনুসরণ করিল। তাহারা বাটীর দশ হাতের মধ্যে আসিলে সরলার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। মনোরমাও আগন্তুকদ্বয়কে দেখিল। তাহারা উভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিল। শার্দ্দূল দেখিলে ভীতা কুরঙ্গিনী যেমন থমকিয়া দাঁড়ায় সেইরূপ দাঁড়াইল, তাহার পর উভয়েই পলাইয়া গেল। সুরেন্দ্র বাবু উভয়কেই দেখিল। তাহার আর সন্দেহ রহিল না। সে নরেশকে বলিল—"নরেশ বাবু। ভুল হয়েচে।"

নরেশ বলিল—"বল্লেই হ'ল ভুল হয়েছে? এই ফটোগ্রাফের সঙ্গে মিলিয়ে নিন্‌না। ও সব কথা শুন্‌ব না। আপনার মাথা খারাপ—" এবার সুরেন্দ্র বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা মশায়! আমি বাপ্ হ'য়ে চিন্‌তে পারবো না?" নরেশ

এ সেই বালিকা। নরেশও টিকিট কিনিয়া ট্রেণে উঠিল, তাহাদের সহিত বেলঘরিয়া ষ্টেসনে নামিয়া আবার তাহাদিগকে অনুসরণ করিল। তাহাদিগের বাটী লক্ষ্য করিল। ভাগ্যক্রমে সেই গ্রামে তাহার কয়েকটী পরিচিত ব্যক্তি ছিল। তাহারা সকলে বলিল বালিকা সে বাটীতে সম্প্রতি আসিয়াছে, ভদ্রলোকটি কাহারও সহিত মিশে না, কাহাকেও পরিচয় দেয় না। তাহাদেরও একটা সন্দেহ দূর হইল। ইহার মধ্যে যে একটা রহস্য আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? নরেশ একজনকে সেই বাড়ীটির উপর লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া—তখনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। সেদিন সুরেন্দ্রবাবু হতাশ হইয়া আমাদিগের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। আমারই সম্মুখে সুরেন্দ্রবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বালিকাকে সনাক্ত করাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া নরেশ এবং সুরেন্দ্রবাবু বেলঘরিয়ায় প্রস্থান করিলেন। আমাকে ঘুণাক্ষরে কেহ কোন কথা জানাইল না। আমাকে বিস্মিত করিবার জন্য নরেশ আমার সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

যাহা হউক, সহসা জীবনধনের কথা শুনিয়া তাহারা উভয়ে স্তম্ভিত হইল। ঘরে বসাইয়া জীবনধন তাহাদিগকে ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। আমার শিষ্য নরেশের কিন্তু তখনও সাহস ছিল, সে বলিল—"মশায়, ওসব চোখ রাঙানির ভয় রাখিনি। সন্ধান পেয়েছি, এবার পুলিস আসছে।"

জীবনধন বলিল "পুলিস আসছে? শুনে সুখী হ'লেম। আমি স্বয়ং পুলিস ডাকতে পাঠাচ্ছি। এ রকম বে-আদবী উপেক্ষা করা যায় না। পরের জমিতে এসে তার কন্যাকে গালি দেওয়ায় বোধ হয় এদেশে জেল হয়। আমাদের পশ্চিমের এই আইন।

সুরেন্দ্রবাবু মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন—না মশায়, মাপ করবেন। আমার একটি কন্যা হারিয়েছে। সেটি ঠিক আপনার কন্যার মত দেখতে। দুজনার চেহারায় এত সাদৃশ্য আছে যে আমি পিতা বলেই বুঝতে পারছি যে এ বালিকা আমার নয়।

"আর এ ভদ্রলোকটি?"

"ইনি মিঃ এন্ সেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এঁর ওপর আমার কন্যা খোঁজবার ভার আছে ব'লে ইনি আমাকে এ স্থলে এনেছেন। ওঁর কোন অপরাধ নেই।"

"ওঃ ইনি গোয়েন্দা! সে কথা অনেকটা বুঝেছিলাম বটে। ধন্য মহাশয়ের জাত। আপনাদের দ্বারা সমাজের ইষ্ট যতদূর হোক আর না হোক লোককে জ্বালাতন করতে আপনাদের জাতের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। দেখছি তো ভদ্রলোকের ছেলে। ভদ্রলোকের ব্যবসা গ্রহণ করতে পারেন নি?"

বলা বাহুল্য নরেশ খুব ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ওরূপ স্থলে বিশেষ বলবিক্রম দেখান যায় না। সে প্রকাশ্যে জীবনধনের সহিত কলহ করিল না। তাহার মনে তখনও সন্দেহ ছিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—মশায়, ওকথা বলবেন না।

ডিটেকটিভ না থাক্‌লে অনেক সময় সমাজে বড় বড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ত না।

জীবনধন বলিলেন—হ্যাঁ, তা বুঝেছি। তা না হ'লে আর আমার কন্যা এখনই পিতৃলাভ করছিল।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—মশায়, এ বিষয়ে মিঃ সেনকে ক্ষমা করবেন। আপনার কন্যাটিকে দেখে বাস্তবিক ভ্রম হয়। আর যদি বে-আদবী মাপ করেন—

জীবনধন বাবু হাসিয়া বলিলেন—মনোগত অভিপ্রায়টা অধীনকে জানিয়ে ফেলুন।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—ঐ যে বর্ষীয়সীটি ছিলেন উনি বোধ হয় মহাশয়ের—

জীবনধন বলিলেন—কি গাই বাছুর দুই দাবী কর্‌বার মতলব নাকি?

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—না, বলছিলাম কি ওঁকে দেখলেও ভ্রম হয় যে অবশ্য ক্ষমা কর্‌বেন, অথচ, মানে হচ্চে যে—

জীবনধন বলিলেন—বুঝেছি। এখন আমি না হয় যাই আপনারাই ঘর-দোর দখল করুন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

জীবনবাবু বলিলেন—অবশ্য আপনি বিপন্ন, আপনার সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—সবই তো বুঝছেন।

জীবনধন বাবু হাসিলেন। তিনি বলিলেন—সন্দেহটা ভাল ক'রে ভঞ্জন করা ভাল। সরলা!

দরজার অন্তরাল হইতে সরলা আমাদিগের দিকে চাহিল অথচ পিতৃ-আহ্বানে দুইজন অপরিচিতের নিকট আসিতে লজ্জা বোধ করিল। জীবনধন বাবু দেখিয়া একটু হাসিলেন। বালিকার গণ্ডস্থল আরক্তিম হইল। তিনি আবার আদর করিয়া ডাকিলেন—এস মা, লজ্জা কি?

সরলা আসিয়া, একেবারে পিতার পার্শ্বে গলা জড়াইয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র বাবু তাহাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বালিকা বড় অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; বলিলেন—মশায়, আপনার মেয়েটি ঠিক মুরলার মত। তবে মুরলা আর একটু মোটা আর ইঞ্চি খানেক উঁচু।

সকলে হাসিল। সরলাও হাসিল। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—এর হাসিটিও আমার মেয়ের মত। একটা বড় ভ্রম ভাঙ্গলো।

জীবনধন বাবু বলিলেন—ভাঙ্গলো ত তবু ভাল।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—না, সে ভ্রম না। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার কন্যাটি অদ্বিতীয় সুন্দরী আর—

জীবনধনবাবু বলিলেন—সেটা উভয়তঃ। আমার এখনও বিশ্বাস যে আমার মেয়ের মত সু—

সরলা পিতার মুখ চাপিয়া ধরিল। লজ্জায় তাহার মুখের লাবণ্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে পলাইল। জোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহারা তিন জন খুব হাসিল। তাহার পিতা ডাকিলেন কিন্তু বালিকা আর আসিল না।

জীবনধন বাবু সুরেন্দ্র বাবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় দিলেন, মুরলার অদৃশ্য হইবার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।

জীবনধনবাবু নানা প্রকার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেশে হাঘুরের দল আসিয়াছিল কিনা, অবনীর পুষ্করিণীতে কুমীর আছে কিনা, জঙ্গলে বাঘ থাকে কিনা, সে রাত্রিতে ফেউ ডাকিতে শুনা গিয়াছিল কিনা ইত্যাদি অশেষ প্রকার প্রশ্নে জীবনধন বাবু আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার আত্মীয় স্বজনের বাটীতে সন্ধান ক'রেছিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন তেমন আত্মীয় স্বজন তাঁহার কেহ নাই। নিন্দার ভয়ে তিনি এ কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিতে পারেন নাই।

"মেয়ের মাতুলালয়ে ?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—আমার বাড়ীর সঙ্গে মেয়ের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। সে জন্মাবার পূর্ব্বেই আমি শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। সেই অবধি আমি শ্বশুরের কোন খোঁজ রাখি না। তিনিও রাখেন না।

জীবনধন বাবু বলিলেন—এটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

সুরেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন—তাঁর সংসারে এ কথা আশ্চর্য্য নয়। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে নিয়েও তাঁর বড় জামাই পালিয়েছিলেন। আমি অনুমতি নিয়ে চলে এসেছিলাম। লোকটা জবরদস্ত।

সুরেন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—নীলমণি গাঙ্গুলি।

জীবনধন কাঁপিতে ছিল। সে বলিল—বিষ্ণুপুরের নীলমণি? তুমি অনুর স্বামী?

সুরেন্দ্র বাবু বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন—মশায়?

"আমি জীবনধন। নীলমণির বড় জামাই।"

পূর্ব্বস্মৃতিতে জীবনধনের চোখে জল আসিল। সে উঠিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে আলিঙ্গন করিল। বড় মধুর মিলন। নরেশ হতভম্ব হইল। কিন্তু সে মনে মতলব ঠাহরাইল। যদি নয় দিনের মধ্যে মুরলার উদ্ধার না হয় সরলার সহিত শীতল প্রসাদের পুত্রের বিবাহ হইবে। সুরেন্দ্র বাবুর সম্মান রক্ষা হইবে, সরলার বিবাহ হইবে, আমাদের কতকটা সাফল্য লাভ হইবে।

তাহার পর কি হইয়াছিল তাহা আমাদের গল্পের বিষয়-ভূত নহে। প্রিয়তমা ভগ্নীর স্বামীকে দেখিয়া মনোরমা কাঁদিয়াছিল,

কাঁপিয়াছিল, তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। মিঃ এন সেন ডিটেকটিভ বেশ এক থাল মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছিল। তখনই তাহারা যশোহর যাত্রা করিয়াছিল।

বহুদিন পরে দুই সহোদরার মিলনে কি শুভ উৎসব হইয়াছিল কিরূপে উভয়ে পরস্পরের কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছিল, এবং হাসি কান্নার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব কৌতুকের অবতারণা করিয়াছিল। সে সকল সংবাদ মিঃ এন্ সেন আমাকে সঠিক দিতে পারে নাই। তবে অনুপমা সরলার গোলাপ-অধরে গণিয়া সাঁয়ত্রিশ বার চুম্বন করিয়াছিলেন তাহা নরেশ এক রকম হলপ করিয়া বলিতে পারে। মোটের উপর সুরেন্দ্র বাবু জীবনধনের নিকট নরেশের প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। জীবনধন শুনিয়া বলিলেন—তাও কি হয় ভায়া?

সুরেন্দ্র বলিল,—দাদা এ কথায় প্রতিবাদ করবেন না। আমাদের মুরলাও যেমন সরলাও তেমন।

তাহার পর একটা রফা রফিয়ত হইয়া গিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে নরেশ ঘূণাক্ষরে আমাকে এ সকল কথার আভাস দেয় নাই। আমি যখন তাহাকে নিষ্ঠুর স্বার্থপর দায়িত্বশূন্য বিবেচনা করিয়া কুপিত হইয়াছিলাম তখন সে এ সকল বিষয় বন্দোবস্ত করিতেছিল। বিবাহ বাসরে যাহাকে দেখিয়াছিলাম সে মুরলা নয় সরলা। দুইটি বালিকাই এক ছাঁচে গড়া, এক উপাদানে নির্ম্মিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধানুসারে শুভকার্য্য ত সম্পাদিত হইয়া গেল। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রম্। সকল দিক বজায় রহিল। কিন্তু মুরলা কোথা? বিবাহের পর আবার সে প্রশ্ন উঠিল। এবার জীবনধন ও সুরেন্দ্র দুইজনে আমাদের আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইজনের সমান আগ্রহ। নরেশের নিকট তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। নরেশ মুরলার যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিল। অপরিচিত আত্মীয়দিগের মিলন ঘটাইয়াছিল, সরলার বিবাহ দিয়াছিল। আর সে তাহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিল। কিন্তু আসল কথার কোনও মীমাংসা হইল না। মুরলা কোথা?

তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—মুরলা কোথা?

ঠিক কথা! মুরলা কোথা? নরেশ বলিল—ঐটাইতো শক্ত কথা। মনে পড়ে সেই গান—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে,"—

আমি বলিলাম—আর আমাদের দ্বারা যে সে তিমির কাটিবে তাও তো বোধ হয় না।

সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কোন আশা নাই?

আমি বলিলাম—একেবারে আশা নাই একথা বল্‌তে পারি নি। কিন্তু আপনার সাহায্য ভিন্ন যে আপনার কন্যার—

সুরেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা?" আমি আবার ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া বলিলাম—"আপনার সাহায্য ভিন্ন আপনার মেয়ে উদ্ধার হ'বার কোন উপায় নাই।" জীবনধন বাবু বলিলেন—"কথাটা ঠিক বুঝলাম না। ওঁর কন্যার উদ্ধারে উনি সহায়তা করবেন না এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে?" আমি বলিলাম—"বাস্তবিক উনি আমাদের সহায়তা করেননি বা করবেন না। উনি যদি সমস্ত কথা যথাযথ বল্‌তেন তো আজ আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয়ও হ'ত না, আর আপনার কন্যা মাথায় সিঁদুর দিয়ে—।" জীবনধন ও নরেশ হাসিলেন বটে কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু ব্যথিতের স্বরে বলিলেন—"সতীশ-বাবু, এটা কি রকম নিষ্ঠুর কথা হ'চ্চে—" আমি বলিলাম—"অপ্রিয় হ'তে পারে কিন্তু কথা সত্য। আপনি দয়া করে যদি কথা গোপন—।" সুরেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"কোন্ কথা গোপন করেছি?" আমি বলিলাম—"চিঠির কথা। দেখুন দেখি।" পূর্ব্বোক্ত চিঠিখানি তাঁহার সম্মুখে ফেলিলাম।

পত্রের আকৃতি দেখিয়া জীবনধন বাবু বিস্মিত হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু তাচ্ছিল্য করিয়া পত্রখানায় হস্তক্ষেপ করিলেন না। আমি টেবিলের ভিতর হইতে অবিনাশের চিঠিখানা বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ফেলিলাম। পত্রখানা তাঁহাকে এমন বিস্মিত করিল যে,—তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত পিতামহকে দেখিলে সুরেন্দ্র

বাবু অতটা বিস্মিত হইতেন না। তাঁহার হাত পা কাঁপিতেছিল। তাঁহার শরীরের যত রক্ত ছুটিয়া মুখে উঠিল। কিয়ৎক্ষণ তিনি কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। জীবনধন বাবু হারানিধি আত্মীয়ের ভাবান্তর দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি চিঠিখানা হাতে লইয়া বলিলেন—"ভাষা কি বর্ম্মায়—না এর ভেতর আবার ছবি রয়েছে যে—মানুষ নাচ্‌ছে এটা কি একটা জানোয়ারের মত যেন কি একটা—"। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"এ পত্র আপনি কোথা পেলেন?" আমি বলিলাম—"রাস্তায়, ট্রাম গাড়িতে।" সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"পরিহাস নয়? ট্রাম-গাড়িতে?" আমি বলিলাম—"হ্যাঁ। অনেক দিন পেয়েছি। মহাশয়কে দেখাইনি আপনি বল্‌বেন না ব'লে।" তিনি বলিলেন—"মশায়, এ পত্রখানা এত দিন আমার হাতে পড়লে কন্যার উদ্ধার হ'ত। এখন বুঝেছি কে আমার শত্রুতা করেছে। অবশ্য মেয়ে সুখে আছে। কিন্তু উদ্ধারের আশা—"। আমি বলিলাম—"মেঘরাজ বা সুবোধ যে শত্রুর কন্যাকে সুখে রাখবে সে দুশ্চিন্তা আমার মোটেই নেই।" বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন—"মেঘরাজ কে?' সুবোধই বা কে?" "অবিনাশ চন্দ্র মিত্র?" "সেই বা কে?" "এ পত্র কে কাকে লিখেছে?" "এলাহাবাদ থেকে নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিখিলনাথ মিত্রকে লিখ্‌ছে।" ব্যাপারটা বুঝিলাম। অবিনাশ ও সুবোধ মিথ্যা নাম। আপনা-দিগের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিবার জন্য তাহারা মিথ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছিল। আমি প্রথমাবধিই তাহাদিগকে সন্দেহ

করিয়াছিলাম। কিন্তু নরেশ ও সুরেন্দ্রবাবুর নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। আপনাকে আর তত বেশী অকর্ম্মণ্য ভাবিতে পারিলাম না। আমি সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলাম —"তা হ'লে বেশ আপনার মেয়ে কোথা আছে তা' ত' এক রকম টের পেলেন। এখন আর আমাদের কোন দরকার নেই।" সুরেন্দ্র বাবু দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বা উর্দ্দু ভাষার মতে ঠাণ্ডা শ্বাস গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"মশায়, এ যে দল এদের সঙ্গে আমার সাধ্য নয় একেলা লড়াই করি। তারা যে কোথায় আছে তাই জানিনি।" অবিনাশ এখনও হ্যারিসন রোডে থাকিত সে সন্ধান রাখিয়াছিলাম। তাহাকে বলিলাম যে আমাদিগের দ্বারা তাঁহার শত্রুদের সন্ধান পাইতে পারিবেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আমি বলিলাম—"মশায় তা হ'লে এ পত্র খানায় কি লেখা আছে তাই বলুন।"

তিনি ইতস্ততঃ করিলেন। আমি বড় বিরক্ত হইলাম। জীবনধন বাবু তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ভায়া, না হয় তো চিঠি খানার ভাবার্থটাই এঁদের বুঝিয়ে দাও না।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"এতে লিখেছে যে আমি আমার মোকদ্দমাটা আপনাদের হাতে দিয়েছি। আপনাদের উপর যেন চৌকী রাখা হয়। তবে মুরলাকে যেন যত্নে রাখা হয়। কিন্তু তাতেও যদি না হয়—"। সুরেন্দ্রবাবু আবার পিতামহের প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। আবার তাঁহার হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। বাল্যকালে পড়া মুখস্ত বলিতে বলিতে থামিলে যেমন একটু খেই

ধরিয়া দিতে হয় আমি তেমনি উৎসাহ দিবার স্বরে বলিলাম—"—তাতেও যদি না হয়—" সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"খুন করবে, মশায়, খুন করবে।" আমি বলিলাম—"ভয় পাবেন না। যে কুকুর বেশী ডাকে সে কুকুর কামড়ায় না।" সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"মশায়, নিবারণ চাটুয্যে বড় ভয়ঙ্কর লোক। তা'র কাজে ও কথায় বড় বেশী তফাৎ থাকে না।" "তা' হলে এত দিন তাদের হাতে আপনার কন্যা নিরাপদে আছে এ ধারণাটা কেমন করে করলেন?" "তা একরকম নিশ্চিত বলা যায়। তার একটা দুর্ব্বলতা আছে—স্নেহ। সে সুবলাকে আমার চেয়ে অধিক স্নেহ করে।" নরেশ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিল "তাদের সঙ্গে কি অবনীর কোনও সংস্রব আছে?" জীবনধন বলিলেন,—"কে অবনী?" আমি বলিলাম—"নরেশ, তুমি ইহুপিডের মত কথা ব'ল না। অবনী যে এ ব্যাপারে একেবারে নির্দ্দোষ তা' কি এখনও বোঝনি?" সে বলিল "আর ভাই। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"না মশায়! অবনী বাবু এ দলের মধ্যে নাই। একটা গোপনীয় কারণে এদের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে তাই আমাকে বশীভূত করবার জন্য তারা আমার মেয়েকে বন্দী করে রেখেছে।" কি কারণে এত বড় শত্রুতা তাহা তিনি বলিলেন না। নরেশ গুণগুণ করিয়া গাহিল—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শঠে শঠে

সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমা এখন অনেকটা সরল হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহের হাঙ্গামাটার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল; অবনী যে নির্দ্দোষ তাহা সপ্রমাণ হইয়াছিল। মুরলা ঠিক কোথায় আছে তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছিল। এখন আমাদের কর্ত্তব্যের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কেবল মেঘরাজ বা সুবোধ বা অবিনাশ তিন মূর্ত্তির এক মূর্ত্তিকে পাইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। কিন্তু সে শনি রাহু কেতুর কোনও সন্ধান পাওয়া একটা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। অবিনাশ মিত্র হ্যারিসন রোড ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। দয়েহাটায় মেঘরাজের কোন চিহ্ন ছিল না। কলিকাতায় পথে পথে নানা কার্য্যে ঘুরিয়াও তাহাদের দর্শন লাভ হইল না।

হাতে তিন চারিটা তদন্ত ছিল। অনেক ঘুরিয়া কলিকাতার নানা পল্লীর বিশেষ বিশেষ গন্ধ উপভোগ করিয়া হ্যারিসন রোডের উপর আসিয়া পড়িলাম। আর একবার অবিনাশ মিত্রের বাটীতে অনুসন্ধান করিলাম কোন সংবাদ পাইলাম না। বেণিয়াটোলার নিকট একটা ফাঁকা জমির উপর একস্থলে কতকগুলা জীর্ণ পুস্তক বিক্রয় হইতেছিল। একটা লোক ভাঙ্গা কাঁচের বাসন, তালাহীন

চাবি, চাবিহীন তালা, মাথাভাঙ্গা ফুলদান, ন্যাপথালিন, চিঠির কাগজ প্রভৃতি দুর্লভ পদার্থ বিক্রয় করিবার জন্য বিপণী খুলিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের পিছনে পীত লোহিত নানা বর্ণের পতাকা শোভিত এক বিচিত্র তাঁবুতে কতকগুলা লোক কৌতুক দেখাইতেছিল! তাম্বুর উপর একখানা বড় কাপড়ে উজ্জ্বল বর্ণে একটা ব্যাঘ্র অঙ্কিত। তাহার লাঙ্গুলের নিকট একটা বালকের মূর্ত্তি—বালকের হস্তে বেত্র, পরিধানে জাঙ্গিয়া। শার্দ্দূলের মস্তকের উপর একটা দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি। বস্ত্রের উপর লিখিত ছিল "নতুন জাপান মেজীক বা জীবন্ত চিতাবাগের লড়াই।" তাম্বুর সম্মুখে একটা বালক এক বৃহৎ আলখাল্লা পরিধান করিয়া, মুখে একটা গর্দ্দভের মুখোস পরিয়া মস্তকে একটা কোণা টুপি দিয়া নানারূপ কদর্য্য অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিতেছিল, আর তাহার সহিত একটা ঢোল, একটা রুক্ষস্বর ব্যাগ পাইপ, একটা বেসুরা এক রীড হারমোনিয়াম ও মন্দিরা বাজিতেছিল। ময়দানের উপর কতকগুলা অলস ব্যক্তি ও রঙ্গপ্রিয় বালক দাঁড়াইয়া সেই সঙ্গীত উপভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একটা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান আসামীর অনুসন্ধান করিবার জন্য অনেক গুলির আড্ডা, কাফিখানা, কোকেনের দোকান প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থলে ঘুরিলাম, ভাবিলাম একবার এই কৌতুক গৃহের ভিতরটা দেখিয়া যাই। এরূপ স্থলে অনেক রকমের লোকের সন্ধান পাওয়া যায়—বিশেষ ইতর শ্রেণীর চোর জুয়াচোরের। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। তখন গীত বাদ্য শেষ হইল, ভিতরের দর্শক-বৃন্দ বাহিরে আসিল।

একজন দলপতি এক গাছি লক্ লকে বেত হাতে করিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। সকলেই নিস্তব্ধ—তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য। সে সহাস্য বদনে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"হাঁ খাঁ সাহেব। ভিতর হইতে শব্দ আসিল—"কি সাহেব?" "তোমার তাঁবুতে কি আছে?" "সোদর বনের বড় বাগ আছে।" "ভিতর আলে" "বাহার আলে।" "তোমার বাগ কি করে।" "খেলা করে আর হাঁক্ মারে।" "আচ্ছা ডাক শুনাও, ভাই।"

ভিতরের লোকটা বোধ হয় একটা লাঠি দিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র বা ব্যাঘ্ররূপী কোন একটা জীবকে খোঁচা দিল। অতি রুক্ষ ভাবে শার্দ্দূলটা "ঘোঁক" করিয়া একটা শব্দ করিল। তখন মহা সমারোহে লোকটা ডাকিতে লাগিল—"চলে আসুন মহাশয়, এক এক পয়সা।" আমি অগত্যা ভিতরে গেলাম, বাহিরে আবার পূর্ব্ববৎ গীত বাদ্য চলিতে লাগিল। ভিতরে দেখিলাম একটা পিঞ্জরে অতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ একটা চিতা বাঘ। দুই পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর আবার গান থামিয়া বক্তৃতা আরম্ভ হইল। আবার লোক আসিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। কি অদৃষ্ট, বেশ ভাল করিয়া দেখিলাম। ভ্রম অসম্ভব। দেখিলাম মেঘরাজ ও সুবোধ বাবু সে কৌতুক স্থলে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ এরূপ স্থলে তাহাদের উভয়কে সম্মুখে দেখিয়া যে কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা [illegible] করা সহজ। তাহারা দুইজনে ঠিক আমার পার্শ্বে আসিয়া

দাঁড়াইল। আমি যেন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি না এইরূপ ভাণ করিলাম। খেলা আরম্ভ হইল। দুই চারিটা ছোকরা আসিয়া খানিক লাফালাফি করিল। শেষে বাঘটাকে একটা খোঁচা মারিল। সেটা অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন একটা ছোকরা বাহির হইতে তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর একটা ছোকরা পিঞ্জরের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি অবশ্য চোখে খেলা দেখিতেছিলাম কিন্তু মন ছিল আমার পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি দুইজনের প্রতি। সুবোধ ও মেঘরাজ কি কথাবার্ত্তা কহে তাহা শুনিবার জন্য বিশেষ উদ্গ্রীব ছিলাম। যখন উক্তরূপ ব্যাঘ্রের ক্রীড়া চলিতেছিল তখন সুবোধ বলিল—বেটারা পাগলা না কি? চল যাই।" মেঘরাজ বলিল—"যাবে কোথা?" সুবোধ বলিল—"একটা মতলব হ'য়েছে। তুমি এস দেখি।" তাহারা দুইজন বাহির হইল। বলা বাহুল্য আমিও বাহির হইলাম। আমার মত তাহাদেরও যেন বিশেষ অবসাদ আসিয়াছিল, তাহারা যে কি করিবে ঠিক করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। অতি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে উভয়ে পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। হ্যারিসন রোডের উভয় পার্শ্বে, একস্থলে নহে বহুস্থলে, অনেক জীর্ণ পুস্তক, গৃহসজ্জার পুরাতন আসবাব প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছিল। তাহারা মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া নানারূপ দুর্লভ পদার্থ পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমিও একটু দূর হইতে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছিলাম।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ও হ্যারিসন রোডের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া তাহারা দুইজনে কি পরামর্শ করিল। মেঘরাজ সোজা হ্যারিসন রোড দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আর সুবোধ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উত্তর দিকে চলিল। আমি উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। এস্থলে কাহার অনুসরণ করি? মেঘরাজের না সুবোধ চন্দ্রের? একবার ভাবিলাম মেঘরাজের অনুসরণ করি কিন্তু তাহাতে ফল কি? সুবোধই নিবারণ, সেই দলের নেতা তাহার অনুসরণেই অধিক ফল। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া আমি সুবোধের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সুবোধ পথের মধ্যে একবার দাঁড়াইল। অগত্যা আমাকেও দাঁড়াইতে হইল। সুবোধ ফিরিল। আমি আর অত শীঘ্র ফিরিতে পারিলাম না। আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অবসর দিবার জন্য আমি পার্শ্বের একটা পানের দোকানে দাঁড়াইয়া সিগারেট কিনিতে আরম্ভ করিলাম। সুবোধও সেই দোকানে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহাকে ঠিক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া একটু উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলাম। সে কিন্তু স্থির ধীর গম্ভীর, কোন উত্তেজনার ভাব তাহার মুখে লক্ষিত হইল না। তাহার অধর-কোণে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের হাসির রেখা। আমরা উভয়ে একটু সঙ্কটে পড়িলাম। শঠে শঠে সাক্ষাৎ হইলে ওরূপ সঙ্কট উভয়ের স্বাভাবিক। সে যে আমাকে সন্দেহ করিয়াছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। উভয়েই দোকানে বিলম্ব করিতে লাগিলাম। এ ক্ষেত্রে যে অগ্রে দোকান ছাড়িবে তাহারই পরাজয়। শেষে চুরুট ধরাইয়া সুবোধ বলিল—

"মহাশয় কি কলিকাতার লোক ?" আমি একটু অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ—আপাততঃ বটে।" সুবোধ অতি সরল ভাবে বলিল—"আচ্ছা, এখানে মিঃ সেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ ব'লে একটা বাড়ীতে সাইন বোর্ড মারা ছিল। সেটা কোন্ দিকে বল্‌তে পারেন ?" বলা বাহুল্য এ কথায় আমার বিস্ময় বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বলিলাম—"মিঃ সেন—হ্যাঁ দেখছি বটে—মিঃ সেন হ্যাঁ হ'য়েছে —কালীতলার একটু আগে।"

সুবোধ বলিল—"আপনিও তো ঐ দিকেই যাচ্চেন। যদি অনুগ্রহ ক'রে একটু দেখিয়ে দেন।" আমি বলিলাম—"হাঁ, যাব বটে। আচ্ছা চলুন।" উভয়ে চলিতে লাগিলাম। এ কথা সে কথা কহিতে কহিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়ের নাম ?" সুবোধ অম্লান বদনে বলিল—"শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" আমি তাহার গতিক কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঠিক আমাদের আফিসের সম্মুখে আসিবামাত্র আমার নির্ব্বোধ দ্বারবানটা সেলাম করিয়া বলিল—"বাবু, আপনার জন্য একজন লোক অপেক্ষা করছেন। আমি এবারে বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। পার্শ্বে নিবারণের দিকে চাহিলাম, তাহার মূর্ত্তি স্থির। সে আমায় বলিল —"আপনি কাজটা সেরে নিন্ না। আপনার সঙ্গে কথা আছে।" আমি বলিলাম—"আপনি ভুল বুঝেছেন। আমার নাম মিঃ সেন না। আমি একজন—" "অংশীদার।" আমি বলিতে যাইতে ছিলাম মক্কেল, সে বলিল 'অংশীদার।' ভাবিলাম আর

আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়া কি হইবে? জানিয়াছে তো তবে কি চায় দেখি না। আমি বলিলাম—"হাঁ।" তাঁহাকে আফিস গৃহে বসাইয়া শীঘ্র অপর কার্য্যটি সারিয়া লইলাম। শেষে নরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া তিন জনে কথা কহিতে বসিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বোকা টিকটিকি

"বুঝতেই তো পারছেন।" "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বিলক্ষণ বুঝছি। মশায় একটি অদ্ভুদ চিজ।" "আজ্ঞে সে নিজগুণে যা বলেন। আমি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে সুরেন্দ্রবাবুর মামলা আপনাদের হাতে আছে—" "আর মেঘরাজকে নিয়ে মশায়ের এ স্থলে শুভাগমনও হয়েছিল। মশায়ের দলের একজন হ্যারিসন রোডে থাকতেন—" "হ্যাঁ, সে সব শুনেছি; তবে মশায় যে সেনের অংশীদার তা' বুঝতে পারিনি। প্রথম যখন যশোরের ট্রেণে আপনাকে দেখি তখন একটু সন্দেহ হ'য়েছিল বটে কিন্তু এমন বোকা লোক যে ভাল টিকটিকি হ'তে পারে সে সন্দেহ হয় নি। আজ পানের দোকানে বুঝলাম—যে মশায়ই সেই বোকা—" আমি তাহার কথার উত্তরে বলিলাম—"মশায় নিজগুণে যা' বলেন। আপনার একটা কথার মাত্রা ছিল সেটা—"সে একটু হাসিয়া বলিল—"সেটা ন্যাকামী,—স্বাভাবিক নয়।"

নরেশ বলিল—"বাজে কথায় কালক্ষেপ ক'রে লাভ কি?

এখন কাজের কথা হ'ক। দেখুন সুবোধবাবু অর্থাৎ নিবারণ বাবু—" নরেশের "অর্থাৎ" শুনিয়া সকলে হাসিলাম। সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"বলছিলাম কি আপনি একজন ভদ্র-লোকের কন্যা চুরি করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। অপরাধটা গুরুতর।" "কন্যাচুরি? বলেন কি? আমি?" যখন সমস্ত বিষয় রফা-রফিয়ত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে, তখন প্রকাশ্য-ভাবে এ ব্যাপারের আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই কন্যাচুরি-ব্যাপারে সুরেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার পত্নী কতদূর বিপন্ন হইয়া-ছেন, শীতলপ্রসাদ বাবুর নিকট তাঁহাদের লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা কতদূর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা নিবারণের নিকট অবিদিত ছিল না। সরলার বিবাহের পর সে আশঙ্কা দূর হইয়াছিল। আমি বলিলাম—"নিবারণ বাবু, মুরলার সঙ্গে তো আপনার কোন শত্রুতা নেই। বরং আপনি তা'কে ভালবাসেন। আপনার যা' কিছু বিবাদ তার বাপের সঙ্গে।" নিবারণ ঘাড় নাড়িল, একবার তার লম্বা গরুড়-নাসার অগ্রভাব ধরিয়া টান মারিল। আমি বলিলাম—"আপনি কেন মুরলাকে আটক ক'রে রেখেছিলেন, তা' এক রকম বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে। মানের ভয়ে শীতলপ্রসাদের অর্থ-প্রত্যর্পণ কর্‌বার ভয়ে যদি সুরেন্দ্রবাবু রফা রফিয়ত করে, আপনার শরণাপন্ন হয়?" নিবারণ যেরূপ ধীর ভাবে আমার বক্তৃতা শুনিতেছিল, বৃদ্ধা ঠানদিদির দল অত মনোযোগ দিয়া শ্রীভাগবত শুনে না। বোধ হইতেছিল যেন সে আমার যুক্তির সমীচীনতা বুঝিতেছে।

এখনি অনুতাপাগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাহার মতামত জানিবার জন্য একবার থামিলাম। অনেকটা ফল ফলিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। কারণ নিবারণ বলিল—"হ্যাঁ ঠিক্। বলে যান।" আমি উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"এখন কিন্তু জগদীশ্বরের অনুগ্রহে ঘটনার স্রোত বদলে গিয়েছে। যে পথে গিয়েছিলেন সে পথে সিদ্ধি নেই, সুতরাং এখন কন্যার মঙ্গলের জন্য তাকে মুক্তিদান করুন। অবনীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে চিরসুখিনী করা যেতে পারে। তার বাপের সঙ্গে অন্য রকমে বোঝা পড়া করুন।" নিবারণ ধীরভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল—"হুঁ! এখন বুঝতে পারছি কেন তার বাপ আমাদের সঙ্গে রফা করতে অগ্রসর হয় নি। সুরেন্দ্রের বিশ্বাস যে, আমি তার কন্যাকে স্নেহ করি। স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তা'র কন্যা কেন,—নিজের কন্যাকে স্বহস্তে বলি দিতে পারি,—একথা সুরেন্দ্র তো জানে।" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অবশ্য তাহার মুখের ভাব বিকৃত হইল না। তাহাকে একটু ভয় দেখাইবার জন্য বলিলাম—"জানেন আপনি কি গুরুতর অপরাধ করেছেন? বিষয়টা সরকারী পুলিশের হাতে দিলে—" একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া নিবারণ বলিল—"কিছুদিন নির্দোষ ব্যক্তির মিথ্যা অপযশ প্রচার করার অপরাধে মহাশয়কে শ্রীঘর বাস করতে হয়। আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ?" আমি বলিলাম—"আপনি আমার নিকট দোষ স্বীকার করেছেন,—এই প্রমাণই যথেষ্ট।" নিবারণ হাসিয়া বলিল—"আপনি

তো তুচ্ছ একটা টিকটিকি। সমাজে সকলের নিকট হেয়। দিন—কাগজ কলম দিন্। আমি অপরাধ লিখে দিচ্চি। আরও লিখে দে'ব যদি আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনার মক্কেল আমাকে সন্তুষ্ট না করে তা হ'লে সে তো ইহলীলা সম্বরণ করবেই, তা'র কন্যাটীকেও নিজের হাতে কাটব। আর মহাশয়েরা আমার সঙ্গে পয়সার লোভে এতটা শত্রুতা করেন, আপনাদেরও বখশিশ্ দিতে ভুলবনা। সন্ধ্যা হ'ল এখন উঠি।" এত বড় স্পর্দ্ধার কথা বলিল তবু নিবারণ চন্দ্রের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। সে যে উত্তেজিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া আমি বলিলাম—"মহাশয়, মেটাবার জন্যে এসে বিবাদ করলে কি হ'বে? আপনি কি চান, সেটা আমাদের জানালে আমরা একটা নিষ্পত্তি করবার চেষ্টা করতে পারি।" নিবারণ বলিল—"মেটাবার কথা আপনাদের সঙ্গে হ'তে পারে না। সুরেন্দ্রকে চাই। আমি তিন দিন পরে ঠিক এই রকম সময় এখানে আসব। ইচ্ছা করেন তো সুরেন্দ্রকে আনিয়ে রাখতে পারেন। আমার সহিত করমর্দ্দন করিয়া আমার চুরুটের কেস হইতে একটা চুরুট লইয়া অতি অমায়িক ভাবে একটু হাসিয়া নিবারণ বিদায় গ্রহণ করিল। লোকটা চলিয়া গেলে, নরেশ বলিল—"বাবা! ও লোকের সঙ্গেও লাগে? কেমন নিজে এসে পরিচয় দিয়ে আপনার দোষ স্বীকার ক'রে অথচ রোকের উপর চ'লে গেল। ও আমাদের চেয়ে ঢের বেশী চালাক। একটা কিছু নতুন মতলব ঠাওরেছে।" আমি

বলিলাম—"নিঃসন্দেহ। এখন কাকেও ওর সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, ওর ঠিকানাটা জেনে আসুক।" নরেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিবারণের ঠিকানা জানিবার জন্য লোকের বন্দোবস্ত করিতে গেল। নিবারণ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু আসিলেন। তাঁহাকে নিবারণ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিলাম। বলা বাহুল্য আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোক বড় ভীত হইলেন। তিনি বলিলেন—"জীবনদাদাকে পেয়ে কেবল যে সরলার বিবাহ দিয়ে মান বাঁচাতে পারলাম তা নয়। নেহাত একলা মাঠের মধ্যে থাকি, তবু একটা সঙ্গী পেয়েছি। আপনারা জানেন না, নিবারণ বড় ভয়ঙ্কর লোক। ওর কথাও যা, কাজও তা'। আমার প্রাণ বধ না ক'রে ছাড়বে না। অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যু নিশ্চয় আছে। দিন, সরকারী পুলিশ দিয়ে হতভাগাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিন।" আমি বলিলাম—"অবশ্য আপনাকে বারবার জিজ্ঞাসা করাটা ভাল না। যদি স্পষ্ট ক'রে খুলে বলতেন যে ও আপনার নিকট কি চায়, আর আপনাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধটাই বা কি,—তাহ'লে বোধ হয় কতকটা উপকার করতে পারি।" সুরেন্দ্রবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আর এক সময় সকল কথা খুলিয়া বলিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় নরেশ-প্রেরিত দূত ফিরিয়া আসিল। সকলে সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি প্রিয়নাথ, কি খবর?" প্রিয়নাথ মুখ ভার করিয়া বলিল—"মশায়, এমন কাজেও পাঠায়? লোকটা তো এ গলি সে গলি চলতে লাগল,

আমিও নাছোড়বন্দা পিছনে পিছনে ঘুরলাম। শেষে জোড়াসাঁকোর একটা গলির মধ্যে গিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল্।” নরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল—“বল কি? তুমি নেহাত অপদার্থ। একটা লোক কলকাতার সহরে তোমার চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। কোথায় ঢুকলো দেখতে পেলে না?” প্রিয়নাথ বলিল—“দাঁড়ান মশায়, এখনও শেষ হয়নি। লোকটা কোথায় গেল আমার মত পাঁচজন থাক্‌লে ধরতে পার্‌ত না। যেমনই সরে গেল, আমি একটু এদিক ওদিক দেখছি হঠাৎ হাসতে হাসতে পিছন থেকে লোকটা এসে আমার কাণ ধ'রে বল্‌লে,—এই রকম করে মনিবের কাজ কর? আমি চোখের সামনে সরে গেলাম, বুঝতে পারলে না? আমি ত নেহাত ছোট ছেলেটি নই,—পুরো ছ'ফুট লম্বা।” সুরেন্দ্রবাবুর মুখ গম্ভীর হইল। আমরা দু'জনে হাসিলাম। প্রিয়নাথ বলিল—“মশায় শেষে লোকটা বল্‌লে—“যাও আর পাহারা দিতে হবে না। এই চিঠি খানা সতীশবাবুকে দিও।” আমি প্রিয়নাথের হাত থেকে চিঠি খানা লইলাম। কালিতে লেখা। নিবারণ বড় সৌখীন লোক। সর্ব্বদা সঙ্গে একটী ফাউনটেন্ পেন্ রাখে। পত্রে লেখা ছিল—“সতীশ বাবু, আমার সঙ্গে লোক পাঠিয়েছেন ভাল হইল, আমায় আর লোক পাঠাইতে হইল না। আমি পরশু সন্ধ্যার সময় যাইতে পারিব না। বুধবারে নিশ্চয় যাইব। আপনার লোকটা বড় বোকা। বোকা টিকটিকির উপযুক্ত বোকা সাগরেদ। পিছনে চাহিতেছি না দেখিয়া সে ভাবিল আমি তাহাকে লক্ষ্য করিতেছি

না। আমার হাতে একখানা আয়না ছিল, সে যেমনি এক একটা গ্যাস পোষ্টের নীচে আসিতেছিল আমি অমনি দর্পণে তাহার গতি বিধি দেখিয়া লইতেছিলাম। আপনারা ডিটেক-টিভ, এ প্রণালীটা কাজে লাগিবে বলিয়া লিখিলাম। নমস্কার জানিবেন—সুবোধ।” পত্র পাঠ শেষ হইলে সুরেন্দ্রনাথ বলিল—“নিবারণের ও গোঁয়ারতুমি চিরকালই আছে। কি ভয়ঙ্কর লোক দেখ্‌লেন।” নরেশ বলিল—“যা হ'ক আপনি বুধবারে আসতে ভুলবেন না। এ রকম লোকের সঙ্গে শত্রুতা করার চেয়ে বন্ধুত্ব করায় লাভ আছে।”

নবম পরিচ্ছেদ

সিরেট বোকা

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের উত্তাপ সহ্য করা যাইলেও ভাদ্রমাসের গরম সহ্য হয় না। আমাদের আফিসে তড়িত পাখা ছিল না। কেবল আফিসগৃহে একখানা টানা পাখা ছিল। তখন কলি-কাতায় অলি গলি ঘুরিয়া দামিনী এত বেশী নরসেবা করিতে আরম্ভ করে নাই। আফিস ঘরে বসিয়া সুরেন্দ্র ও নিবারণ তাহাদের বিবাদ মিটাইতেছিল। তাহাদের গোপনীয় মন্ত্রণায় আমাদিগের উপস্থিতি সম্বন্ধে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিয়াছিল। তাহাদিগকে আফিস গৃহ ছাড়িয়া দিয়া আমরা উপরে গল্প করিতে-ছিলাম। কোথাও একটু হাওয়া ছিল না। তালবৃন্ত কিছুই

করিতে পারে নাই। গরমে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল। নরেশ বলিল—"বাবা! এদের ব্যাপারটাতো কিছু বুঝি না।" আমি বলিলাম—"যৌবনে সকলে জোট বেঁধে একটা জাল জুয়াচুরি ক'রেছিল, বোধ হয় এখন বখরা নিয়ে গোল বেধেছে।" নরেশ বলিল—"না, ঠিক তা' নয়, এর ভেতরে একটা স্ত্রীলোক আছে।" "দূর পাগল। যখন দেখ্‌ছ দলের ভেতর একটা মাড়োয়ারী আছে, আরও দু তিনজন লোক, তখন টাঁকা-কড়ির বিবাদ ভিন্ন অন্য কোন বিবাদ হ'তে পারে না। সুরেন্দ্র বাবুর একটু অর্থের উপর লোভ আছে, এটাতো দেখেছ। কাজেই সুরেন্দ্র বাবু ওদের যৌথ অর্থ হ'তে কিছু মেরে এসে ওভারসিয়র হ'য়ে বসেছেন। ওরা তা'র সংবাদ পেয়ে"—ঠিক এই সময় নীচের ঘরে গুড়ুম করিয়া একটা পিস্তলের শব্দ হইল। আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। নিমেষ মধ্যে নীচে নামিয়াই দেখি গম্ভীরভাবে নিবারণ তাহার বাইসিকেল লইয়া পথে বাহির হইয়া তাহার উপর উঠিল। নরেশকে ঘরের ভিতর সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিতে বলিয়া আমিও তাড়াতাড়ি একখানা বাইসিকেল লইয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিলাম। নিবারণ প্রায় আমার সম্মুখে কুড়ি হাত দূরে ছিল। আমি যত বেগ বাড়াইতে লাগিলাম সেও তত বেগে ছুটিতে লাগিল। তখন প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়াছিল। রাস্তা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ছিল। নিবারণ হেরিসন রোডের ভিতর ঢুকিয়া পূর্ব্বমুখে ছুটিল, আমি দুই তিন সেকেণ্ড তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি যখন মোড় ফিরিলাম দেখিলাম সে একটু বেশী অগ্রসর হইয়াছে।

আমার প্রায় ত্রিশ হাত অগ্রে ছুটিতেছে। আমি একটু দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিলাম। একে ভীষণ মানসিক উত্তেজনা, তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্মে পা আর চলিতেছিল না। তবুও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া প্রায় তাহার বিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। প্রথম প্রথম ছুটিবার সময় নিবারণ এক একবার পিছনে চাহিতেছিল এখন আর পিছনে না চাহিয়া সটান চলিতে লাগিল। বুঝিলাম সেও ক্লান্ত হইয়াছে বলিয়া আর পিছনে চাহিতেছে না। হেরিসন রোড পোষ্ট আফিসের পার্শ্ব দিয়া সীতা-রাম ঘোষের ষ্ট্রীটে পড়িয়া উত্তর মুখে দৌড়িতে লাগিলাম। পথের মধ্যে কেবল একটা পানের দোকানে একবার মাত্র একজন পাহারাওয়ালা দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে মাথার লাল পাগড়ি নামাইয়া জুতা খুলিয়া "গুকা" টিপিতেছিল। চীৎকার করি নাই। কারণ দ্রুত বাইসিকেল ধরিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাহার হইবে না। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর আসিয়া নিবারণ বাইসিকেলের একটু গতি কমাইল। আমারও ক্লান্তিতে গতিরোধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহাকে আস্তে যাইতে দেখিয়া আমি একবার প্রাণপণ-চেষ্টায় গতিটা বাড়াইলাম। বেগ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলাম। যখন তাহার নিকট হইতে পাঁচ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তখন সে সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে। আমি হাঁফাইতে হাঁফাইতে চীৎকার করিয়া বলিলাম—"আর কেন? থাম থাম।" হঠাৎ বাইসিকেল থামিল, আরোহী নামিল। জানিতাম তাহার হস্তে একটা রিভলবার বা পিস্তল আছে কাজেই

তাহার কু-অভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া নিমেষ মধ্যে আমি গাড়ি হইতে নামিয়া গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। দুইজনেই তাহার বাইসিকেলের উপর পড়িয়া গেলাম। তাহাকে বলিলাম—"নরঘাতক! পিশাচ! চোর! এবার তোমায় ধরেছি, আর যাবে কোথা?" আমার বন্দী একটা ঝাপটা মারিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—"পাগল নাকি? কি বলচেন?" তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি আবার শিহরিয়া উঠিলাম। এ সে লম্বনাসা কৃষ্ণবর্ণ নিবারণের মুখ নহে। লোকটা কি যাদুকর নাকি? উত্তেজনায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। ফ্রেঞ্চ ফ্যাসানের দাড়ি, পাকান গুম্ফযুক্ত একটি যুবকের মুখ! কি বিড়ম্বনা! কি রহস্য! ওঃ! লোকটা মায়াবী নাকি? কি যাদুবলে একেবারে সমস্ত মুখটা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল তা বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত চেহারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, নলচে ও খোল উভয়ই বদল করিয়াছে। একবার তাহার দাড়ি গোঁফ ধরিয়া টানিলাম। যদি সে গুলা কৃত্রিম হয়তো খসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা হইল না। এবার লোকটা বিরক্ত হইয়া বলিল—"মশায়, আমি আপনাকে ক্ষমা করব না। পাগলই হন আর যেই হন্, পুলিশে দিব। পুলিশ! পুলিশ!" আমি ধীরে ধীরে তাহাকে ছাড়িয়া উঠিলাম। লোকটিও উঠিল। গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া রুমালে মুখ মুছিয়া বাইসিকেলটা তুলিয়া লোকটা আমার মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"নাম দিন। আমি এ ব্যাপারটা সহজে ছাড়তে পারিব না।" আমি

লোকটাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম একটা ভুল করিয়াছি। যুবকটি শিক্ষিত ও ভদ্রবংশীয় বলিয়া বোধ হইল। তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম—"মহাশয়, একটা লোক খুন ক'রে আমার সামনে বাইসিকেল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে অনুসরণ করছিলাম। অন্ধকারে কোন্ গলির মধ্যে পালিয়েছে বুঝতে পারলাম না।"

নরহত্যা হইয়াছে শুনিয়া যুবকটি বিগত-ক্রোধ হইল। বিস্ময়ে আমাকে বলিল—"আমি যখন শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট থেকে বেরুই তখন আমাকে শিয়ালদহের মুখে ফিরতে দেখে একটা লোক বাইসিকেল থেকে নেমে বাম দিকের গলিতে ছায়ায় দাঁড়াইল। আমি যখন হ্যারিসন রোডে পড়ি, তখন আপনাকে দেখতে পাইনি। বোধ হয় আমাকে আগে ছুটতে দেখে আপনি আমাকে সেই লোক ভেবে আমার অনুসরণ করবেন সেই অনুমানে সে গাড়ি থেকে নেমে গলিতে দাঁড়াল। আমরা অগ্রসর হলে বোধ হয়—অন্য কোনও পথ দিয়ে পালিয়েছে। নিবারণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আমি বিস্মিত হইলাম। একটা নরহত্যা করিয়া অবিচলিত ভাবে কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া বাহির হইযা পলাইতে পলাইতে অনুধাবক যখন ভুল করিতে পারে, সেই অবসর বুঝিয়া একটু অপেক্ষা করা, তাহার পর আবার পলাইয়া যাওয়া, খুনের লাইনে বড় একটা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সন্দেহ নাই। ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আপনি যদি ইচ্ছা করেন তা হলে সে যে স্থলে দাঁড়িয়েছিল দেখাইয়া দিতে পারি।" আমি অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম।

নিজের অসারত্ব স্মরণ করিয়া মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিলাম। ভদ্রলোকটির নবাবদি ওস্তাগর লেনে কি একটা আবশ্যক ছিল। তাহা সারিয়া লইয়া তিনি আমার সহিত আবার চলিলেন। হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসিয়া তিনি আমাকে সেই স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। বাস্তবিক, নিবারণের অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে সেইটি আদর্শ স্থল। গলির মুখেই একখানি বড় অট্টালিকা এবং হ্যারিসন রোডের উপর একটা মেহগিনি গাছ সেই স্থানটাকে আরও অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে নিবারণ দাঁড়াইয়াছিল দাগ প্রভৃতি দেখিয়া তাহাও নির্ণয় করিতে পারা গেল। ধূলার উপর একখণ্ড সাদা কাগজ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহা তুলিয়া লইলাম। গ্যাসের আলোকে পাঠ করিয়া দেখিলাম তাহাতে লেখা আছে—"সতীশ বাবু, তুমি অতি মূর্খ একটা লোক চোখের উপর দিয়া পালাইল ধর্‌তে পা'রলে না? নমস্কার জেনো।" ভদ্রলোকটি বলিল—"ওঃ, এতো বড় ভয়ঙ্কর লোক দেখ্‌ছি।" "সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে?" তাঁহার নামটি লইয়া বাসায় ফিরিলাম। মনে ভাবিলাম, আমি শুধু বোকা নই। নিরেট বোকা।

দশম পরিচ্ছেদ

ওয়ারেণ্ট

তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলাম। মনে শান্তির লেশ মাত্র ছিল না। সুরেন্দ্র বাবু জীবিত ছিলেন কি না তাহাও বুঝিতে পারি নাই। সুবোধের উপর সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছিলাম। হয়ত আমারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অকালে তাঁহাকে—

ভীষণ চিন্তা! শিহরিয়া উঠিলাম। দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহে ফিরিলাম। আফিস গৃহ তখনও স্থানে স্থানে নররক্তে রঞ্জিত ছিল। বিষম মানসিক উত্তেজনা! কম্পিতকণ্ঠে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবুরা কোথায়?" ভৃত্য বলিল—"হাঁসপাতালে।" আমি অতি ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবু বেঁচে—মানে বেশী চোট—অর্থাৎ ঠিক বেঁচে আছেন্ তো?" তাহার কথা হইতে বুঝিলাম সুরেন্দ্র বাবুর স্কন্ধের নিকট আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। শেষে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। স্বয়ং নরেশের কাঁধ ধরিয়া গাড়িতে উঠিতে পারিয়াছিলেন। নরেশ ও তাঁহার সহিত হাঁসপাতালে গিয়াছিল। এ সংবাদে অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। তবু মনের চাঞ্চল্য একেবারে দূরীভূত হইল না। ভীষণ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হাঁসপাতালে আর সে সময় যাইলাম না। সুরেন্দ্র বাবু সংক্রান্ত সকল কথা মন হইতে যতই

তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম, ততই নানারূপ আকার ধারণ করিয়া নানা রকম মুখোস পরিধান করিয়া, আমাকে বিভীষিকা দেখাই-বার জন্য, একে একে কেবল তাঁহারই কথা মনের মধ্যে উঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমি দুই গ্লাস বরফ জল পান করিয়া সবে মাত্র চুরুটটি ধরাইয়াছি এমন সময় সংবাদ আসিল যে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর সমভিব্যাহারে নরেশ চন্দ্র প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কাজেই আরাম-কেদারা ছাড়িয়া আবার নীচের আফিস ঘরে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই সেন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে সতীশ, আসামী কোথায়?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"আসামী আর কোথা? যথাস্থানে আছে।" ইন্‌স্পেক্টর আমাদিগের বন্ধু। সে হাসিয়া বলিল—"রাগ কর কেন? ধর্‌তে পারনি বুঝি?" আমি এবার হাসিয়া সপ্রতিভভাবে বলিলাম—"আর ভাই, সে কথা বল কেন? ধর্‌তে না পারা এক, আর নিরেট বোকা সাব্যস্ত হওয়া এক ভিন্ন কথা। সে কথা পরে শোনাচ্ছি। এখন রোগীর অবস্থা বল দেখি।"—নরেশ বলিল—"রোগীর কোন ভয় নাই। নিবারণের গুলি সুরেন্দ্রবাবুর কাঁধের হাড় স্পর্শ ক'রে গেছে মাত্র। ঐ দেখ না পিছনের দেওয়ালে গিয়ে গুলিটা লেগেছে।" ইন্‌স্পেক্টর আমাদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে গুলির টুকরাগুলি সযত্নে তুলিল। নরেশ বলিল—"সুরেন্দ্র বাবু খুব অদৃষ্টের জোরে আজ বেঁচে গেছেন!" আমি বলিলাম—"কাজটা আমাদের পক্ষে যতদূর ছেলেমানুষি হ'বার তা' হয়েছে। আমরা জান্‌তাম যে সুরেন্দ্রবাবুর সে ভীষণ শত্রু। তবু তার তল্লাসী

না নিয়ে তাকে সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছিলাম।" তাহারা উভয়েই স্বীকার করিল যে, কার্য্যটা বুদ্ধিমানের মত হয় নাই। তাহার পর আমি সে দিন সুবোধকে ধরিতে গিয়া কিরূপ অপদস্থ হইয়াছিলাম সে কাহিনী তাহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলাম। শেষে ইন্‌স্পেক্টরের দ্বারা কোর্ট হইতে সুবোধ ওরফে নিবারণের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া লইবার বন্দোবস্ত হইল। তাহার হস্তে অনেক কাজ বলিয়া ওয়ারেণ্ট জারি করিবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে থাকিবে, ওয়ারেণ্ট আমরা পাইব। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রবাবুর কন্যা-চুরির কথাটা গোপন রাখিবার জন্য আমি তাহাই চাহিতেছিলাম। একটা বিষয়ে সুবিধা হইল। এতদিন প্রমাণাভাবে আমরা সুবোধকে ধরিতে পারি নাই। এখন তাহার নূতন অপরাধের জন্য তাহাকে ধরিয়া হাজতে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে অচিরেই মুরলাকে উদ্ধার করিতে পারিব, মনে মনে এইরূপ আশার সঞ্চার হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জালের ভিতর

নিবারণ ও তাহার দলের লোকের অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিলাম। কেবল আমরা দুইজনে নহে, আমাদের অধীনস্থ সকল ডিটেক্‌টিভ কলিকাতার পথে ঘাটে অলিতে গলিতে কয়েক দিন ধরিয়া তাহার অনুসন্ধান

করিল ; কিন্তু তাহাদের কাহারও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। আমাদের এক রকম ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে। পুলিসেরও দুই একজন লোক আমাদিগকে সাহায্য করিতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্ব্বৃত্তদের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। তবে তাহারা কলিকাতায় থাকিলে নিশ্চয় তাহাদের সন্ধান পাইব, এ ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। একদিন নরেশ বলিল—"দেখ, ভাই, তাদের কল্‌কাতার বাহিরে যে আড্ডা আছে সুরেন্দ্রবাবু তা জানেন। তুমি যশোরে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে জেনে এস।" নরেশের কথা বেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল। আমি বলিলাম,—"তা' আজই আমি যশোর যাব এখন। কিন্তু তিনি যদি তাঁদের রহস্যটা সম্পূর্ণ-রূপে আমাদের না বলেন, তা'হলে আমরা এ তদন্ত ছেড়ে দেব। সুরেন্দ্রবাবু এক রকম আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভয়ে তাঁহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্কন্ধে তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। আমাকে দেখিয়া সুরেন্দ্রবাবু বড় প্রীত হইলেন। কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন— "সতীশবাবু, এসেছেন ভালই হ'য়েছে। হতভাগা এখনও নিরস্ত হয়নি। কাল একটু হাওয়া খাবার জন্তে মাঠের দিকে গিয়েছিলাম হঠাৎ পিছন থেকে নিবারণ এসে—" সুরেন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। তিনি নীরব হইলেন। জুজুর নামে খোকা যেমন শিহরিয়া উঠে তিনি তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন। আমি হাসিয়া সাহস দেখাইয়া বলিলাম—"কি স্পর্দ্ধা। তার পর?" "তার পর

সেই পুরাণো কথাটা”—আমি বাধা দিয়া বলিলাম—“সে পুরাণো কথাটা কি?” সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—“আর একদিন বল্‌ব। সে কিছু না। কেবল জুলুম কর্‌তে চায়।” আমি বলিলাম—“আচ্ছা থাক্। তার পর?” “তার পর আমি একটু আমতা আমতা করছি এমন সময় জীবন দাদা এসে “খুন” “খুন” ক’রে চীৎকার কর্‌লেন। নিবারণ হেসে ধীরে ধীরে চলে গেল। আমরা সাহস ক’রে তাকে ধর্‌তে পারলাম না।” আমি একটু চিন্তিত হইলাম। তাঁহাকে নিবারণ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বেশ বুঝিলাম, তিনি নিবারণের উপস্থিত জীবন-সম্বন্ধে কোনও কথা জানেন না। আমি ভগ্নমনোরথ হইয়া ষ্টেশন-অভিমুখে গমন করিলাম। ষ্টেশনের নিকট পঁহুছিয়া দেখিলাম প্ল্যাটফরমে নিবারণ পায়চারি করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কিরূপ উত্তেজিত হইলাম, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। দুর্ভাগ্যক্রমে সঙ্গে ওয়ারেণ্টখানা ছিল না। যশোহর ষ্টেশনে কোন পুলিশের লোক দেখিলাম না। এ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা ভাবিয়া বড় বিচলিত হইলাম। একটা সোরগোল করিলে যে বাঙ্গালী যাত্রীরা বিনা ওয়ারেণ্টে তাহাকে ধরিবে এ দুর্ভাবনা ছিল না। নিবারণ যেরূপ ধূর্ত্ত, তাহাতে সে হয় তো আমাকেই খুনী আসামী বলিয়া ধরাইয়া দিবে। অলক্ষ্যে তাহাকে অনুসরণ করিয়া তাহার সহিত কলিকাতা অবধি গিয়া শিয়ালদহে পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিব এই সিদ্ধান্ত করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এমন দুর্লভ রত্নের দর্শন পাইয়াছিলাম। কোনও

প্রকারে তাহার সঙ্গ ছাড়িব না, যেমন করিয়া পারি তাহাকে গ্রেপ্তার করিব মনে মনে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। আমাকে দেখিতে পাইলে নিবারণ ঠিক পলাইবে তাহা বুঝিয়াছিলাম। আত্মগোপন করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলাম। নিবারণ আমাকে আদৌ দেখিতে পায় নাই। সে ধীরে ধীরে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়া বসিল। আমি কতকগুলা লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া তাহার পার্শ্বের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে বসিলাম। জানালা দিয়া তাহার গাড়ির উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখিলাম। প্রথম ঘণ্টা বাজিল। তখনও সে কিছু বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিল দেখিলাম, সে বেশ ধীরভাবে খবরের কাগজ পড়িতেছে। তৃতীয় ঘণ্টা বাজিল, তখনও নিবারণ কিছু সন্দেহ করে নাই। গার্ড বাঁশি বাজাইয়া সবুজ নিশান উড়াইল! কি শুভ মুহূর্ত্ত। এ রকম সুখ খুব কম অনুভব করিয়াছি। প্রাণের ভিতর মুহূর্ত্তের জন্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলাম। ট্রেণ ছাড়িল, জয় জগদীশ্বর! পুলক অনুভব করিলাম। এবার বাছাধনকে—একি! সহসা নিবারণ উঠিল। তাহার গাড়ির দরজা খুলিল। আমি বিস্মিত হইলাম। আমার হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িল। আমিও কালবিলম্ব না করিয়া গতিশীল ট্রেণ হইতে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িলাম। নিবারণ একগাল হাসিয়া সম্মুখে যে গাড়ি পাইল হাতল ধরিয়া তাহার উপর উঠিয়া পড়িল। আমিও যেমনি সম্মুখের গাড়িতে উঠিতে গেলাম পিছন হইতে একটা

লোক আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—"কি করেন মশায় ? মারা পড়বেন যে, অমন গোঁয়ারতুমি করবেন না।" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"কে হে বাপু ? ছাড় ! ছাড় ! খুনের আসামী পালায় !" লোকটা বলিল—"ট্রেণ ছুটছে দেখছ না। শেষে কি গোঁয়ারতুমি ক'রে পৈত্রিক প্রাণটা হারাবে ?" আমি তাহাকে ঝাপটা মারিয়া একবার উঠিতে গেলাম। লোকটা আবার আমার হাত ধরিল। এই কয় সেকেণ্ডের গোলমালে গাড়িখানা আমাদের ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। আমি একবার সতৃষ্ণ নয়নে গমনশীল ট্রেণের দিকে চাহিলাম। গাড়ির একটি প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া সহাস্যবদনে নিবারণ আমাকে প্রণাম করিল। হাত নাড়িল। অপমানে, ঘৃণায়, ক্ষোভে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। যে লোকটা আমায় ধরিয়াছিল একবার তাহার দিকে চাহিলাম। কি সর্ব্বনাশ ! উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে লোকটা অবিনাশ ওরফে নিখিল মিত্র। সে আমায় চিনিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তাহা না হইলে, সে আমাকে ধরিয়া রাখিবে কেন ? আমি যে তাহাকে চিনি নাই তাহাকে সে কথা উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য বলিলাম—"মহাশয় তো বেশ ভদ্রলোক ! দেখুন দেখি একটা খুনে লোক পালিয়ে গেল।"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া অবিনাশ বলিল—"বলেন কি ? মশায় কি পুলিসের লোক নাকি ? বাধা দিয়ে তো অন্যায় করেছি। লোকটাকে দেখে কিন্তু খুনে ব'লে বোধ হয় না।" আমি জানিতাম, অবিনাশ সকল কথা জানে। তাহার নিকট একটু

গর্ব্ব করিয়া তাহার প্রাণে ভীতি-সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে আমি বলিলাম—"আর পালাবেই বা কোথায় ? আমার কাছে লোকটার মাথার টিকি বাঁধা, সমস্তই জানি। আজকার মত রেহাই পেলে এই অবধি। হয় ত কল্‌কাতায় গিয়ে রাত্রিতেই ওকে গ্রেপ্তার করব।" লোকটা বলিল—"আচ্ছা, সত্যই কি খুন ক'রেছে ? কলিকালে লোক চেনা শক্ত। কি বলেন, ইনস্পেক্টর বাবু ?" তাহার উপর হইতে সন্দেহ অপসারিত করিবার জন্য সে আমাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল। আমি আর প্রকাশ করিলাম না যে আমি তাহাকে নিবারণের দলভুক্ত বলিয়া জানি। আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রবাবুর বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলাম। কলিকাতায় ফিরিবার জন্য রাত্রিতে যশোহর ছাড়িলাম। সমস্ত রাত্রি একবার চোখের পাতা বুজি নাই। অবিনাশ ওরফে নিখিল মিত্র সেই ট্রেণে উঠিয়াছিল। কাজেই তাহার উপর একটু লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। তাহার গতিক দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, আমি যে তাহাকে চিনিতাম সে কথা সে বুঝিতে পারে নাই। সে মোটে একবারমাত্র আমাকে তাহার বাসায় দেখিয়াছিল। ভোরের সময় ট্রেণ কলিকাতায় পঁহুছিল। অবিনাশ একখানা গাড়িতে উঠিয়া গাড়োয়ানকে কি বলিল। গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইল। আমিও একখানা গাড়ি চড়িতে যাইতেছি এমন সময় আমার সহকারী প্রিয়নাথকে দেখিলাম, সে বলিল—"বাবু, বড় খবর আছে।" আমি তাহাকে বলিলাম—"নরেশ জানে ?" সে বলিল—"হ্যাঁ বাবু। আপনি শীঘ্র বাসায়

যান।" আমি বলিলাম—"আচ্ছা, সময় নষ্ট না ক'রে ঐ গাড়িখানার অনুসরণ কর। দেখ দেখি কোথা যায়? ঐ লম্বা লোকটির ঠিকানা—বুঝেছ? আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। অবিনাশ যে গাড়িতে চড়িয়াছিল আমি সেই গাড়ির নম্বর লইয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় ফিরিবামাত্র নরেশ বলিল—"ওহে, তোমার আসামী কাল রাত্রে বোম্বাই মেলে কাশী গেছে।" "বল কি তা হলে সন্ধ্যার সময় যশোরের ট্রেণ থেকে নেমেই আবার পালিয়েছে। যা'ক একটা ভাল হ'ল, লোকটা আর সুরেন্দ্রবাবুকে জ্বালাতে পারবে না।" নরেশ বলিল—"কি ক'রেছি শোন। প্রিয়নাথ হাওড়ার ষ্টেশনে সেই আফিমের কেসটার জন্য ঘুরছিল। হঠাৎ নিবারণকে দেখতে পায়। ভাগ্য-ক্রমে প্রিয়নাথ সে সময় লুঙ্গি পরে দাড়ি মুখে দিয়ে মুসলমান সেজে বেড়াচ্ছিল। সে নিবারণকে কাশীর সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনতে দেখে। তখনই টিকিট ঘর থেকে সে তার টিকিটের নম্বরটা সংগ্রহ করে। গাড়ি ছাড়লে সে এসে আমাদের খবর দেয়। আমি ইন্স্পেক্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে মোগলসরাই ষ্টেশনে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি। যে লোকটার হাতে সেই নম্বরের টিকিট পাবে তাকে ধরবে।" কথাটা তেমন ভাল বিবেচনা করিলাম না। সে যেরূপ সতর্ক তাহাতে তাহার পক্ষে একটা নূতন চাতুরী করা অসম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে সে জানিত না যে, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। প্রিয়নাথকে মুসলমান পোষাকে চিনিতে পারা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

নরেশের কথাবার্তায় বুঝিলাম নিবারণ প্রিয়নাথের উপর সন্দেহ করে নাই। আমি নিজের দুর্ঘটনার কথা নরেশকে আদ্যোপান্ত বলিলাম। সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"তুমি বাস্তবিক বোকা।" আমি তাহা স্বীকার করিলাম। সে বলিল—"দেখ, আইন পড়ে লোকে কাপুরুষ হয়। একটা মূর্খ জমাদার কি পাহারাওয়ালা হ'লে সঙ্গে ওয়ারেণ্ট ছিল না বলে সে অমন আসামীকে ছাড়ত না। তুমি ন্যায়ের তর্ক করতে গিয়ে—" আমি বলিলাম—"ঠিক বলেছ যা হ'ক, এখন বোধ হয় লোকটা জালের ভেতর পড়েচে। তবে সে যে রকম চতুর এখনও বিশ্বাস নেই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আবার ফাঁকি

"কিহে প্রিয়নাথ, কি হ'ল?" ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রিয়নাথ বলিল—"মশায়, বড় ঠকিয়েছে!" "ঠকিয়েছে কিহে? দিনের বেলা ঠকালে কি রকম?" "মশায় আপনি তো আমাকে গাড়িতে চড়িয়ে দিলেন। আমি লোকটার অনুসরণ করলাম। তার খোলা গাড়ি, কাজেই দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে আরম্ভ করলাম। গাড়িখানা সার্কুলার রোডের উপর দিয়ে বৌবাজারের পথে গেল। সেখান থেকে চুনাগলির মধ্যে ঘুরে চিনেপাড়া, পিটার্স.লেন, ব্ল্যাকবারণ লেন, টিরেটিবাজারের ভেতর দিয়ে আবার চিৎপুর রোডে পড়ল। আমার গাড়োয়ানটা

মাঝে একবার বল্‌লে, কি মহাশয় এত ঘুরাচ্চেন কেন? আমি তা'কে বখশিসের আশা দিয়ে ছুটোলাম। তার পর চিৎপুর রোঁডের উপর দিয়া গাড়িখানা সটান ময়দানের দিকে ছুট্‌লো। শেষে ধর্ম্মতলার মোড়ে ঠিকাগাড়ির লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি একটু বিস্মিত হ'লাম, গাড়ি দাঁড় করিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ীর ভেতর দেখতে গেলাম। দেখলাম গাড়ি শূন্য। গাড়োয়ানটা হাসছে।" নরেশ বলিল—"এ জহুরির দল। কি ক'রে খবর পেলে যে প্রিয়নাথ আমাদের লোক?" "তাই ত আশ্চর্য্য হ'চ্চি। বোধ হয় সতর্কভাবে যেতে যেতে একখানা গাড়ি অনুসরণ করচে দেখে সন্দেহ হ'য়েছে।" প্রিয়নাথ বলিল—"মশাই, তার পর শুনুন। গাড়োয়ানটা হেসে বল্‌লে—'কি বাবু, বাজি হারলেন?' আমি বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লাম—'কিসের বাজি?' সে বল্‌লে—'কেন বাবু? আমার গাড়ির বাবু আমাকে সব বলেছেন। খোলা গাড়ির ঐ সুবিধা, লোকে কোচমানের সঙ্গে কথা কহিতে পায়। বৌবাজারের মোর পার হ'য়ে বাবু বল্‌লেন--কোচমান পিছনের গাড়ির বাবুর সঙ্গে বাজি হ'য়েছে যে যদি তা'র চোখে ধূলা দিয়ে পালাতে পারি তা'হলে দশ টাকা পাব। তুমি কেবল গলির ভিতর দিয়ে চল। আর আমি নেমে গেলে গাড়ি থামিয়ো না। ঘুরতে ঘুরতে সটান ধর্ম্মতলার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে। গাড়োয়ান হ'লেও তো আমাদের প্রাণে সখ্‌ আছে, বাবু। সকালবেলা এমন একটা মজার খেলা পাওয়া গেল। বাবুকে বল্‌লাম—আমার বখ্‌শিস। 'এই নাও তিন টাকা।' কিন্তু ফূর্ত্তি ক'রে কাজ

কর।' তার পর চিনেপাড়ার ঐ গলি গুলার মধ্যে বাবু যে কখন নেমে গেলেন আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারলাম না।" আমি বলিলাম—"হুঁ। দলটা চালাক বটে।" প্রিয়নাথ বলিল—"চালাক ব'লে চালাক! আমায় একেবারে বোকা বানিয়ে দিলে।" আমি গম্ভীরভাবে একটা চুরুট ধরাইয়া টানিতে লাগিলাম। নরেশ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রিয়নাথ কার্য্যান্তরে গমন করিল। এ কয়দিনের কার্য্যের উত্তেজনায় সমস্ত কেসটা একবার ভাবিতেও পারি নাই। আজ একবার বসিয়া সমস্ত ঘটনাগুলা পূর্ব্বাপর ভাবিয়া লইলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, ঐ দলের একটা লোকের গেরেপ্তারের উপর সমস্ত সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য—বালিকাটিকে উদ্ধার করা। নিবারণ ব্যতীত অপর কেহ ধৃত হইলেও সে কার্য্য উদ্ধার হইবে না। অপর কাহারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনও মোকদ্দমা ছিল না। তাহাদের ধরিতে পারিলেও যে বিশেষ কিছু ফল হইবে তাহা বলিয়া বোধ হইল না। তবে একটাকে অনুসরণ করিয়া একবার যদি তাহাদের আড্ডার সন্ধান পাইতে পারি তাহা হইলে সিদ্ধিলাভের বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু এ দলের প্রত্যেকেই যেরূপ সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা করিতেছিল তাহাতে যে সে বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিব, প্রাণে এরূপ আশা আদৌ ছিল না। নরেশ চুরুট মুখে করিয়া বোধ হয় সেই বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আচ্ছা, ধর যেন নিবারণকে ধর্‌লে। তা'হলেই বা কি

হবে? সে একটা অপরাধ করেছে। তার দরুণ সাজা পাবে। তার উপর আবার কেন কন্যা চুরির কথাটা প্রকাশ ক'রে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করবে? সে চুপ ক'রে থাকবে। আমাদের কন্যা-চুরির রহস্যটা সেই পূর্ব্বের মত জটিলই থেকে যাবে।" বলা বাহুল্য এ বিষয়টিও আমার মনে উঠিয়াছিল, তজ্জন্যই আমার পূর্ব্বাপর চেষ্টা ছিল যাহাতে লোকটাকে সরকারী পুলিশের দ্বারা না ধরিয়া স্বয়ং ধরিতে পারি। একবার বন্দী হইয়া আমার আয়ত্তাধীন হইলে তাহার পক্ষে আমার সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করা অসম্ভব নহে। কন্যা পাইলে গুলি মারার জন্য নিবারণকে শাস্তি দিতে সুরেন্দ্রবাবু ততটা আগ্রহাতিশয্য দেখাইবেন না। মুরলার পরিবর্ত্তে সে যদি তাহার স্বাধীনতা ফিরাইয়া পায়, যদি সে একবার বুঝিতে পারে যে কন্যা প্রত্যর্পণ না করিলে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টার জন্য সুরেন্দ্রবাবু প্রাণপণে মামলা চালাইবেন, শেষে জুরির বিচারে হয়ত তাহাকে আন্দামানে বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে সে মুরলাকেই প্রত্যর্পণ করিবে, স্বাধীনতা হারাইবে না। নরেশ আমার যুক্তিটা সমীচীন বলিয়া বোধ করিল। সে বলিল—"হ্যাঁ, এটা মন্দ পরামর্শ নয়। কিন্তু তা' হ'লেও তারা সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বিবাদ করতে ছাড়বে না।" আমি বলিলাম—"সে পরের কথা। আপাততঃ তো মেয়েটা পেলে লোকগুলার উপর চাপ দিতে পারি। কিন্তু এদের যে কোন রকমে হাতে পাব এমন তো বোধ হয় না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জালের মাছ

সন্ধ্যার সময় আমরা বসিয়া বাদানুবাদ করিতেছি এমন সময় সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বদিন নিবারণের নিকট কিরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত হইয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। তাহার পর নিখিলের খবর পাইয়াছি, সম্ভবতঃ তাহারও সন্ধান করিতে পারিব, এ সংবাদও তাঁহাকে দিয়াছিলাম। কাজেই তিনি গৃহে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সংবাদের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমাদের জাল হইতে কিরূপ ভাবে আসামীরা পলাইয়া গিয়াছে তাহা শুনিয়া ভদ্রলোক হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"মশায়, একটা বিষয় সিদ্ধান্ত করেছি।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কি বিষয়?" তিনি বলিলেন—"তাদের প্রস্তাবে, স্বীকৃত হইব। তা' হ'লে জীবনটা থাকবে আর কন্যাটাকেও ফিরিয়ে পাব।" আমি বলিলাম—"তাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে গেলে আপনাকে কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তা তো বলতে পারি না।" তিনি বলিলেন—"ক্ষতি স্বীকার! যদি তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি, যদি আমার উপস্থিত ধন রেখে যেতে পারি তা হলে আমার পর দু তিন পুরুষ পরিশ্রম না করে সুখে কাটাতে পারবে। আর যদি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হই, তা হলে আমাকে একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। সর্ব্বদা প্রাণ-ভয়ে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করার

চেয়ে দরিদ্র হয়ে মনের শান্তিতে বাস করা শতগুণে ভাল।” মুখে এত বড় কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতর লোভে ও প্রাণ-ভয়ে একটা ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল তাঁহার মুখে এ কথা লিখিত ছিল। সুরেন্দ্রবাবুর সহিত নিবারণের দলের যে অর্থ লইয়া বিবাদ চলিতেছিল সে ধারণা আমার বহুদিন হইয়াছিল। যাহা হউক আজ মনের আবেগে আমাদের বিশ্বাস করিয়া সুরেন্দ্র-বাবু যে এতটা কথাও বলিলেন—তাহাতে আশ্বস্ত হইলাম। একটা কথা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম সুরেন্দ্র বাবুর মত নিবারণও অর্থ-লোভী যদি কখনও ভবিষ্যতে তাহার সন্ধান পাই নিবারণকে অর্থের লোভ দেখাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই অর্থের বিবাদটার মূলে একটা রহস্য ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ধীরে ধীরে সে রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের ভৃত্য আসিয়া একখণ্ড পত্র দিল। দেখিলাম পত্রখানা থানার ইন্‌স্‌পেক্টরের নিকট হইতে আসিয়াছে তাহাতে লেখা ছিল—

“প্রিয় সতীশ!

“মোগলসরাই রেলপুলিশের নিকট হইতে তার আসিয়াছে। তোমার আসামী ধরা পড়িয়াছে। শীঘ্র প্রস্তুত হও। আজই রাত্রে তোমাকে আমার সহিত মোগলসরাই যাত্রা করিতে হইবে।”

পত্রখানা পাঠ করিয়া বড় আনন্দ হইল। সুরেন্দ্রবাবু তো এক রকম নৃত্য করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—“মশায়, যত

টাকা খরচ হয় আমি দিব। হতভাগা যেন কোনও প্রকারে নিষ্কৃতি না পায়। আমি টেলিগ্রাফ খানা পড়িলাম। তাহাতে লিখিত ছিল—"Arrested denies charge come sharp identification." অর্থাৎ "ধৃত হইয়াছে, অপরাধ অস্বীকার করিতেছে, সনাক্ত করিবার জন্য সত্বর আসুন।" টেলিগ্রাফটা পাঠ করিয়া আমি একেবারে হতাশ হইলাম। ভাবিলাম নিবারণ কখনই ধরা পড়ে নাই। আবার একটা কি খেলা খেলিয়াছে। নরেশ ও সুরেন্দ্র বাবু আমার এ যুক্তি অনুমোদন করিল না। তাহারা বলিল—"ধরা পড়লে সব আসামীই অস্বীকার করে। এবার বাছাধন জালে পড়েছেন।" একবার ভাবিলাম হইতে পারে। ভগবান পাপীর শাস্তিবিধান করিয়াছেন। আমাদের প্রিয়নাথকে সে কখনই চিনিতে পারে নাই। এ ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে জালে পড়া মোটেই অসম্ভব নহে। যাহাই হউক যখন বারো ঘণ্টার মধ্যেই এ বিষয়ে সত্য কথা জানিতে পারা যাইবে, তখন আর এ বৃথা মাথা ঘামাইয়া কি ফল?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বন্ধন-যোগ

আসামীটির মুখে গোঁফ দাড়ি ছিল না। নিবারণের সহিত তাহার সাদৃশ্য এই অবধি। ইহা ব্যতীত দুইজন লোকের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতির যতটা পার্থক্য থাকিতে পারে মোগলসরাই

ষ্টেশনের বন্দী ও নিবারণের মধ্যে তাহা ছিল। নিবারণ লম্বা, এ ভদ্রলোক খর্ব্বাকৃতি। নিবারণ কৃষ্ণবর্ণ, ইনি গৌরবর্ণ। ইঁহার দিব্য নধর চেহারা, মুখে সৌম্যভাব। বন্দী হইয়া ইনি প্রথমে চাঞ্চল্য দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রেলওয়ে পুলিশ তাঁহাকে অতি যত্নে ইন্‌স্‌পেক্টরের গৃহে রাখিয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি ভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া আমাদের আগমনে তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখিলাম না। একটা ভ্রম হইয়াছে বুঝিয়া আমরাও যেমন হাসিতেছিলাম। তিনিও তেমনই হাসিতেছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, ভদ্রলোক কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। ছুটি লইয়া বারাণসী যাত্রা করিয়াছিছেন। আমি নিবারণের আকৃতি বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সেরূপ কোনও লোক তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন কি না? তিনি বলিলেন—"হাঁ, ছিলেন।" আমি বলিলাম—"আচ্ছা, টিকিট কিনে আপনি টিকিটখানা কোথায় রেখেছিলেন?" ভদ্রলোক খুব হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত হলেই লোকে একটু মূর্খ হয়। বজ্র আঁটন হলেই ফস্কা গেরোর ব্যবস্থা।" আমি বলিলাম—"তবুও টিকিটখানা কোথা রেখেছি'লন, শুনি।" তিনি বলিলেন—"আমার চাদরার মনিব্যাগে রেখে মনিব্যাগটা একটা ছোট কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দিয়েছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনাদের কোথার কোথায় টিকিট চেক হয়েছিল মনে আছে?" তিনি বলিলেন—"রাত্রে দুই এক স্থানে টিকিট চেক হয়েছিল, অত লক্ষ্য করিনি।" রেলওয়ে

পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর আমাদের সহিত তদন্তে যোগ দিতেছিল। সে বলিল "বর্দ্ধমানে প্রথম টিকিট চেক হয়।" আমি বলিলাম —"আচ্ছা, টিকিটখানা টিকিট কলেক্টরের হাতে আপনি নিজে দেন, না কোন লোকের মারফত দেন।" পণ্ডিত মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এখন যাই আপনারা কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন আমার মনে হচ্ছে প্রথম বারটা আমি বাঙ্কের উপর শুয়েছিলাম। আমাকে সেই গোঁফ দাড়ি কামানো লোকটি উঠিয়ে বল্‌লেন, মশায়, আপনার টিকিট দেখতে চাইছে। আমি শুয়ে শুয়ে তাঁর হাতে টিকিটখানা দিলাম। পরীক্ষার পর সে আমাকে টিকিটখানি ফেরত দিলে। কোনও রকমে ভ্রম হবার ভয়ে আমি একবার টিকিটখানা পড়ে দেখলাম, ঠিক বেনারসের টিকিট। আমি টিকিটখানা আবার কোমরে জড়িয়ে শুলাম।" আমার সঙ্গী কলিকাতার ইন্‌স্‌পেক্টর হাসিয়া বলিল—"এই অবসরেই বদ্‌লে নিয়েছে।" রেলওয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, ঐ অবসরেই বদ্‌লেছে।" আমি বলিলাম—"কি রকম ভয়ঙ্কর লোক দেখলেন।" উহারা দুইজনে ভ্রূকুঞ্চন করিল। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, টিকিট দেখাইবার পূর্ব্বে তিনি কোথায় যাইবেন তাহা সে লোকটি জানিত কিনা। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"মহাশয় বুঝতেই তো পারচেন আমরা সবাই বাঙ্গালী আরোহী ছিলাম সুতরাং বালি পার হবার পূর্ব্বেই কে কি দিয়ে ভাত খেয়ে ট্রেণে উঠেছে সে সম্বন্ধেও কথা বার্ত্তা হ'য়ে গেছে। কাশীর যাত্রী কেবল তিনি —৬

আমি ছিলাম ব'সে দু'জনের আলাপটা একটু বেশী মাত্রায় হ'য়েছিল।"

আ।—তিনি কোথা নামলেন বলতে পারেন?

প।—তা বলতে পারি নে। গয়া ষ্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়লে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অপর দুজন আরোহী নেমে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন হাজারিবাগ যাবেন জানতাম। ইনি যে কোথায় নেমে গেছেন তা বলতে পারি নে।

রেল-ই।—আর সে কথা বলাও শক্ত হ'বে। তা'র কাছে কাশীর টিকিট আছে কিনা সে তো আর মাঝের ষ্টেশনে টিকিট দেবে না। আর লোকটা টিকিট না বদ্‌লালেও পারত। সেই টিকিট দেখিয়ে মাঝের ষ্টেশনে নেমে পালাতে পারতো।

আমি বলিলাম,—না মশায়। সে ঠিক জানত না আমরা কোথায় টেলিগ্রাফ কর্‌ব! কাজেই টিকিট বদলান তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল এবং যথা-সম্ভব প্রথম ষ্টেশনেই কাজটা সেরে নিয়েছিল। ইন্‌স্‌পেক্টর দুইজন আমার যুক্তির সমীচীনতা বুঝিল। বলা বাহুল্য, সে পণ্ডিতটিকে তখনই মোচলেকা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাঁহার নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি যাইবার সময় বলিলেন—"মশায় একরকম হ'ল ভাল। আমার কুম্ভ রাশি। এ সময় একটা বন্ধনযোগ ছিল কেটে গেল। পাপের বোঝা নিয়ে কেহ বিশ্বেশ্বরের দেখা পায় না। আমার যেটুকু পাপ ছিল প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেল। আর বন্ধনযোগেরও ফাঁড়াটা কেটে গেল।"

আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলাম। তাহার পর আমাদিগের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয় একটা পরামর্শ চলিতে লাগিল। সকলে সিদ্ধান্ত করিলাম যে, একবার গয়ায় অনুসন্ধান করা উচিত। কলিকাতার ইনস্পেক্টর বলিল,—হ্যাঁ, গয়া সহরটাও আমি দেখিনি। একবার কোম্পানীর খরচায় বেড়িয়ে যেতে ক্ষতি কি ?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গৃহবিবাদ

রেলওয়ে ইনস্পেক্টরের নিকট হইতে গয়ার পুলিশের উপর পত্র লইয়া আমরা গয়ায় পৌঁছিলাম। সেখানে দুই তিন দিন সমস্ত সহরময় ভ্রমণ করিয়াও কোনও সন্ধান পাইলাম না। কাজেই ইন্স্পেক্টর কলিকাতায় চলিয়া গেল। আমি অপর একটা কাজের সন্ধান পাইয়া সে স্থলে আরও দুই চারিদিন থাকিতে ইচ্ছা করিলাম। গয়ায় পৌঁছিবার প্রায় সাতদিন পরে সন্ধ্যার সময় রামশীলা পাহাড়ের নিকট বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ বোধ হইল কে যেন আমাদের অনুসরণ করিতেছে। গয়ায় বদ্মায়েসের অভাব নাই। লোকগুলাকে দেখিবার জন্য পাহাড়ের নীচে যেখানে সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, আস্তে আস্তে ঘুরিয়া গিয়া সেই স্থলে দাঁড়াইলাম। ধীরে ধীরে দুইটা লোক আসিয়া সিঁড়ির উপর বসিল। তাহাদের

মুখ দেখিতে পাইলাম না। কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহারা বাঙ্গালী। একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা গেল?" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"এইখানে যে বেড়াচ্ছিল।" প্রথম ব্যক্তি বলিল—"আচ্ছা আমি জানি ও কোথা থাকে। না হয় কাল বাসায় যাব এখন। কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"নিশ্চয়। নিবারণ কি এটা ভুললেন যে আমি না থাক্‌লে সে এতদিন ধরা পড়তো! সে দিন যশোরে তো ধরা পড়েছিল। আমি কেবল হাত ধরে টেনে বোকা গোয়েন্দাকে গাড়িতে উঠতে দিলাম না।" প্রথম ব্যক্তি বলিল—"আর অমন মেয়েটাকে বন্ধ করে রেখে একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে।" আমি তো এ রকম কথাবার্ত্তার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আপনাদের মধ্যে আমাকে বোকা গোয়েন্দা বলিয়া ডাকিত। হা অদৃষ্ট! লোকগুলা আমায় আবার নূতন করিয়া নির্ব্বোধ প্রমাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছিল, কি বাস্তবিক তাহাদের সহিত নিবারণের কলহ হইয়াছিল, সে কথা বুঝিতে পারিলাম না; অন্ততঃ একটা খবর পাওয়া গেল, দলের কতকগুলা লোক এ স্থলে আছে। আমি অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। কোজাগরী পূর্ণিমা রজনী। গোয়েন্দা হইলেও চাঁদের আলোতে মুগ্ধ হইলাম। ইন্দু-কিরণে দেখিলাম পাপ-মলিন দুইজন দুর্ব্বৃত্তের মধ্যে একজন অপরিচিত ও অপর ব্যক্তি অবিনাশ ওরফে নিখিল। আমাকে দেখিয়াই তাহারা উঠিল। আমি সঙ্গে

সঙ্গে রিভলভার লইয়া ঘুরিতাম। হাতের যন্ত্রটি তাহাদিগের প্রতি দেখাইয়া বলিলাম—"দেখ বাবু চালাকি নয়!" গম্ভীরভাবে নিখিল বলিল—"না মশায় লড়ায়ের ইচ্ছা নেই। আর লড়াই করলে আপনি আমাদের সঙ্গে পারেন না। তা বারম্বার সপ্রমাণ করে দিয়েছি। এখন একটা পরামর্শ আছে। যদি আমাদের বিশ্বাস করেন তো একটা উপকার করতে পারি।" আমি বলিলাম—"তোমাদের বিশ্বাস করব এত মূর্খ তো নহি।" নিখিল বলিল—"চলুন পুলিসের ইনস্পেক্টরের সঙ্গে গিয়ে কথাবার্ত্তা ক'য়ে আসি। যা কিছু কথা তাঁর সম্মুখে হ'বে।" বাস্তবিক মনে আশার সঞ্চার হইল। অদৃষ্টগুণে বিভীষণ জুটিয়াছিল। বাঙ্গালার সমাজের ইহা সনাতন ধর্ম। গৃহ বিবাদ। হাঃ! হাঃ! রাজা নিবারণচন্দ্র এবার কোথা যাবে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অবশেষে

এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য? অকপট বিশ্বাস না গোয়েন্দা-সুলভ সন্দেহ? সন্দেহ করিয়া ছাড়িয়া দিলে লাভ কি? বিশ্বাস করিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে বিপদেরই বা সম্ভাবনা কোথা? তাহারা আমার সহিত পুলিশ ষ্টেশনে গিয়া সকল কথা বিবৃত করিতে স্বীকৃত হইল। মিথ্যা হইলে এরূপ ব্যবহারে তাহাদের কি ইষ্ট হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারীর

সমক্ষে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা আমার নিজের ইষ্টসিদ্ধি-সম্বন্ধে অন্তরায় হইতে পারে। সুরেন্দ্রবাবুর কন্যা-চুরির বিষয়টা গোপন রাখা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিখিল বলিল—সতীশ বাবু তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তো বলুন আপনার বাসায় যাই। উত্তম কথা! ইহাতে আমার আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আবার একবার তাহাদিগকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম। বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া তাহাদের মনোভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম—"বেশ কথা, আমার বাসা বেশ নির্জ্জন, সেই খানেই চলুন কথাবার্ত্তা হ'বে।" নিখিল বলিল—"মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনতে হ'বে। মুরলা সাতদিন আগে কোথা ছিল সে সংবাদ জানি। কিন্তু নিবারণকে ধরবার সময় আমরা সামনে যা'ব না। আপনাকেও পরামর্শ দিচ্চি যে আপনিও—" আমি বাধা দিয়া বলিলাম—'কেন?" নিখিল বলিল—"কেন? সে এখন মরিয়া হ'য়েছে। সরকারী পুলিশের হাত দিয়েই তা'কে গেরেপ্তার করিয়ে দেবেন।" আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, —"আমাকে যতটা বোকা ঠাওরান আমরা তত বেশী বোকা নই। আপনারা তো ঠিকানাটা দিন তারপর যা' হয় হ'বে।" নিখিল বলিল—"কিন্তু একটা সই চাই। আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হ'বে, তারপর আমরা সব কথা বল্‌ব। যে সব কথা বল্‌ব, তা'তে আমাদেরও অনেক গুণের কথা, বুঝতে তো পারচেন?" নিখিল হাসিল। আমি বলিলাম—"তা জানি সবাই একদলের,

মায় সুরেনবাবু অবধি।” নিখিল বলিল—“বোঝেন ত। বলছিলাম কি, আমাদের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে হয়তো আপনার লোভ হ’বে। আপনি পুলিশ ডাকিয়ে পাঠিয়ে আমাদের সোপর্দ্দ করে দেবেন।” আমি বলিলাম—“কেন আপনারা তো নিজেরাই থানায় যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।” নিখিল বলিল—“পুলিশে গেলে কি আর এত বেশী কথা বলতাম্।”

মুরারপুরে আমি বাস করিতেছিলাম। একটি গলির ভিতর বাসা। বেশ নির্জ্জন স্থান। আমি না দেখাইয়া দিলে নিবারণের দল আমার সন্ধান পাইত না। তিনজনে গল্প করিতে করিতে বাসায় আসিলাম। বেহারী ভৃত্য দরজা খুলিয়া দিল। আমি তাহাদিগকে ঘরে বসাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম! প্রাণটা একবার কাঁপিয়া উঠিল! মনকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম—“ভয় কি? সঙ্গে ত একটা মারাত্মক যন্ত্র আছে।” উভয় পক্ষই ক্ষণকাল স্থির থাকিলাম। নিখিল বলিল,—“তা হ’লে প্রতিশ্রুত হ’লেন? কথা দিলেন?” আমি অভয়দান করিলাম। তাহার পর নিবারণকে ধরাইয়া দিলে আমি তাহাদিগকে কি পারিতোষিক দিব তাহা স্থির হইল। মুরলার উদ্ধারের জন্য অবশ্য বিভিন্ন পারিতোষিক। নিখিল বলিল—“তবে প্রথমে নিবারণকে ধরিয়ে দিই। এই নিন।” যাদুকরের মত নিখিল হাত নাড়িল। দরজা খুলিয়া ঘরে নিবারণ প্রবেশ করিল। মুখে এক মুখ হাসি! হাতে একটা রিভলভার। আমি চমকিত হইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রিভলভার তুলিলাম।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বন্দী

নিবারণ বলিল—"থাক্ থাক্ । কথায় বলে বাঙ্গালীর হাতে অস্ত্র, স্থির হ'ন।" আমি ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে জ্বলিতেছিলাম। সেই দিন যে আমার জীবনের শেষ দিন, তাহা বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না। কি চাতুরী! কি কূটবুদ্ধি! কি কুক্ষণে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম? হায়! হায়! পরের জন্য কেন এ ভীষণ দস্যুদলের সহিত শত্রুতাচরণ করিলাম। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ পৃথিবীর একটা ভার দূর করিয়া যাওয়া উচিত। কম্পিত হস্তে রিভলভার তুলিলাম। নিবারণের দল হাসিয়া উঠিল। তাহারা বলিল,—"ঠক্ ঠক্ ক'রে হাত কাঁপচে যে। ওতে কি লক্ষ্য ঠিক হয়। আগে একটু ঠাণ্ডা হ'ন তার পর সমরসাধ মেটাব।" আমি নির্ব্বাক হইয়া বসিলাম। ভূমিতে বন্দুক ফেলিয়া দুই হাতে মুখ লুকাইলাম। হাসিবার কথা কিছু নাই। আমার অবস্থায় পড়িলে স্বয়ং নেপোলিয়ান—বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারও কাঁদিত।—হাঁ কাঁদিয়াছিলাম! নিবারণ সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"ছিঃ খোকা কেঁদ না। সত্যিই কি আর তোমায় মারব?" আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে বলিল—"না না তোমার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই। বল তো কেন আমাদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্চ?" আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম—"ধর্ম্মের জন্যে, সুবিচারের জন্যে—" নিবারণ হাসিয়া

বলিল—"বাজে কথা! পেটের জন্যে।" সকলে হাসিল। আমি তাহাদিগের বন্দী। কাজেই মৌনাবলম্বন করিলাম। নিবারণ বলিল—"না, না হাসির কথা নয়। যদি বাস্তবিক আপনি ধর্ম্মের জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকেন তা হলে কি আপনার আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়? সবই তো জানেন।" আমি এ কথার কোনও প্রত্যুত্তর দিতে পারিলাম না। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল সে প্রাণের ভিতর হইতে কথা কহিতেছে। আমি তাহার কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম,—"আমাকে নিজের বাসায় এ রকমে বন্দী করবার কি উদ্দেশ্য?" নিখিল বলিল—"সত্য কথা শুনবেন?" আমি বলিলাম।—"হাঁ।" নিবারণ বলিল—"খুন করিবার জন্য।" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। নিবারণ পকেট হইতে একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ও এক শিশি ঔষধ বাহির করিল। নিখিল একখানা ছুরি বাহির করিল। ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত জীবনের ইতিহাসটা একবার স্মরণ করিয়া লইলাম। বাল্যকালে মাতার কাসুন্দীর হাঁড়ি হইতে কাসুন্দী, পাখীর বাসা হইতে ডিম্ব প্রভৃতি যত রকম পদার্থ চুরি করিয়াছিলাম, যত মিথ্যা কথা কহিয়াছিলাম, যত পাপ করিয়াছিলাম সমস্ত স্মরণ করিলাম, যমপুরীর বিভীষিকা, যমদূতের তপ্ত কটাহ, তপ্ত মুষল মনের মধ্যে তাথিয়া তাথিয়া করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নিবারণ কোন কথা বলিল না। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল—আমার কাতর দৃষ্টিতে তাহার পাষাণ প্রাণ মোটেই

গসিল না। নিখিল বলিল—"এই তিন রকম মৃত্যুর পথ আছে। এই বিষ এই পিচকিরি দিয়ে রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দিলে—" আর আমি চোখে কিছু দেখিতে পাইলাম না। অজ্ঞান হইয়া সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাণ ভিক্ষা

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর নিবারণ বলিল—তোমায় মারব না। আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে সুরেন্দ্রকে একবার বাছতে বলব সে কি মৃত্যু চায়। যেরূপ মোলায়েম ভাবে লোকে পুত্র কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করে. নিবারণ সেইরূপ ভাবে এ প্রস্তাব করিল। আবার তাহার কুৎসিত মুখ স্বাভাবিক ধীর ভাব ধারণ করিল। তাহারা সদলবলে উঠিল। হঠাৎ নিবারণ ফিরিয়া বলিল—"তোমাকে দয়া করলাম তোমার মনের অবস্থা দেখে। কিন্তু সুরেন্দ্রকে—"আমি সাহস পাইয়া বলিলাম—এ কলহের কি একটা নিষ্পত্তি হয় না। আমাদের দ্বারা কি উভয় পক্ষের একটা বন্দোবস্ত অর্থাৎ মিটমাট —বুঝ্ছেন ত।" কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। নিবারণ বসিল। নিখিল ও অপর ব্যক্তিও বসিল। প্রাণটা আবার শিহরিল। নিবারণ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"হ'তে পারে। আর কতদিন এ

ভাবে কাটাব।" আমি বলিলাম—"হ্যাঁ। সকল পক্ষের শান্তি!"

নিবারণ বলিল—"দেখুন, কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মসংযম হারাইয়াছিলাম বলিয়া এত লুকোচুরি এত ছুটাছুটি। যদি সে দিন ঘৃণা করিয়া সুরেন্দ্রকে গুলি না মারি তাহা হইলে আপনারা আমার কিছু করিতে পারিতেন না। আপনাদের চক্ষের উপর বসিয়া যাহা ইচ্ছা আজ্ঞা করিতাম—আমার প্রাপ্য গণ্ডা পাইতাম।" আমি সে কথার প্রতিবাদ করিলাম না। সে বলিল—"মেয়েটাকে হাত করলাম। সুরেন্দ্র নিশ্চয় বশে আস্‌ত। না হয় শেষে খুন কর্‌তাম।" আমি বলিলাম—"এখন কি হ'লে সকল দিক বজায় থাকে?" নিবারণ বলিল—"সুরেন্দ্র তার মেয়ে নিক্, আর আমাদের প্রাপ্য—" আমি বলিলাম—"প্রাপ্যটা কি?" নিবারণ বলিল—"আবার চালাকি? কেবল দয়া ক'রে আজ প্রাণ দিয়েছি। কিন্তু আবার যদি বিরক্ত কর তাহ'লে—" আমি বলিলাম—"বাস্তবিক কিছু জানি না।" নিবারণ তাহার জীবনের ইতিহাস বলিল। আমি সেরূপ আবেগময়ী ভাষায় বলিতে পারিব না। সংক্ষেপে বলিতেছি।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নিবারণের ইতিহাস

নিবারণ সুরেন্দ্রের বাল্যবন্ধু। বাল্যাবধি দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাহাদের অকপট সৌহার্দ্য, বিমল ভ্রাতৃভাব এক মুখে নহে, শতমুখে প্রশংসিত হইত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। উভয়ের এক আশা, আজীবন পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে বাঁধিয়া রাখিবে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেমন যৌথ পরিবারে বাস করে, ইহারা তেমনি একসঙ্গে থাকিবে। ইহাদের জীবনের এই অভিলাষ, এই আকিঞ্চন। যৌবনের দ্বারে উপনীত হইয়া তাহাদের আশৈশব প্রণয় মধুর সৌহৃদ্যে পরিণত হইল। সামান্য অর্থ লইয়া বাঙ্গালাদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পশ্চিমে অর্থোপার্জ্জন করিতে ছুটিল। দুই বন্ধুর পারিবারিক জীবন তাঁহাদের এ সাধু সঙ্কল্পে সহায়তা করিয়াছিল: সুরেন্দ্রের সহিত তাহার আত্মীয়-স্বজনের তেমন সম্প্রীতি ছিল না। আর নিবারণচন্দ্র অসমসাহসিক, ডানপীটে ছেলে; কাহারও কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া জীবনধারণ করিবে, সে শিক্ষা, সে প্রবৃত্তি তাহার আদৌ ছিল না। তাহাদিগের প্রথমোদ্যম কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু অর্থাগমের সহিত তাহাদিগের অর্থপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে গেলে সামান্য একটু কথার হেরফের্ করিতে হয়, মনকে একটু আঁখি ঠারিতে হয়, বিবেকের সহিত একটা বন্দোবস্ত

করিতে হয়। ইহারা অবশ্য এ সকল কার্য্য করিত। তবে ছগ্‌মলের সহিত তাহাদিগের পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাহারা অসাধুতা আশ্রয় করে নাই। আমরা যাহাকে মেঘরাজ বলিয়া জানিতাম তাহারই নাম ছগ্‌মল। ধূমকেতুর ন্যায় ইহাদিগের জীবনাকাশে ছগমল উদিত হইল; দুই বন্ধুর স্থলে এখন তিন বন্ধু জুটিল; তিনবন্ধুরই হৃদয়ে এক প্রবল বাসনা; কিসে অর্থ সঞ্চয় করিবে, কিরূপে প্রভূত ধনের অধিস্বামী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিবে। কিন্তু ছগ্‌মলের সহিত ইহাদিগের পরিচয় হইবার পরেই চঞ্চলা কমলা ইহাদিগের নিকট হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় লইলেন। কানপুর ছাড়িয়া বন্ধুত্রয় জব্বলপুরে আসিয়া একটী কারবার খুলিয়া দিল। নামে ছগ্‌মল্ কারবারের মালিক হইল বটে কিন্তু ইহার লাভ লোক্‌সানে তিনজনের সমান অংশ রহিল। এবার তাহারা ধন উপার্জ্জন করিল বটে, কিন্তু তাহাদের অধঃপতন পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইল। বুদ্ধিটা ছগ্‌মলের। কি উপায়ে তাহারা এবার অর্থোপার্জ্জন করিল বলিতেছি। তাহারা কাপড়ের দোকান খুলিল। প্রথমে মহাজনদিগের নিকট হইতে দুইদিনের সর্ত্তে কাপড় লইত, দুই দিন গত হইতে না হইতেই মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিত। একমাসের মধ্যে ছগ্‌মলের ব্যবসার বেশ প্রতিষ্ঠা জন্মিল। মহাজনদিগের নিকট তাহাদের সুনাম ঘোষিত হইল। এখন তাহারা পনের দিনের ধারে মাল পাইতে আরম্ভ করিল। মহাজনের নিকট হইতে মাল আনিয়া সেই মাল কম দামে বেচিয়া ছগ্‌মল্ টাকা তুলিতে

লাগিল এবং মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিল। এক মহাজনের মাল বেচিয়া অপর মহাজনের ঋণ পরিশোধ, একের টুপি অন্যের মাথায় দিয়া ব্যবসায় জটিল করিয়া তুলিল। শেষে রোক্ ৩০,০০০৲ টাকা বাজার মারিয়া তাহারা জব্বলপুর ত্যাগ করিয়া ধানবাদের নিকট কয়লার খনি ক্রয় করিল। এখানে আসিয়া সুরেন্দ্র ও নিবারণ আবার একবার সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। ভগবানও তাহাদিগকে দয়া করিলেন। সে সময় সুরেন্দ্র ও নিবারণ উভয়ে স্ত্রী লইয়া একবাসায় থাকিত। ছগমল্ বিভিন্ন এক বাসায় থাকিত। সুরেন্দ্র সেই সময় শ্বশুরের সহিত কলহ করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যায়। এই স্থলেই মুরলার জন্ম হয়। নিবারণের সন্তানাদি জন্মিল না, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণে কোনরূপ অশান্তি ছিল না; কেন থাকিবে? সুন্দরী মুরলা সুরেন্দ্রের যেমন স্নেহের সামগ্রী তাহারও তেমনি স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। উভয়ে মিলিয়া মুরলার ধনীগৃহে বিবাহ দিবে, মুরলার ভবিষ্যৎ স্বামীর হস্তে তাহাদের ব্যবসায়ের ভার দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে, এইরূপ কত নিরর্থক সুখ-কল্পনায় তাহারা তখন কালাতিপাত করিত, ভাবিত অসদুপায়ে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নূতন কারবার আরম্ভ করিয়াছে, সে টাকা তাহারা পরে দরিদ্রকে দান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইহারা দুইজনে যে মনের সুখে দুইতিন বৎসর অতিবাহিত করিল, সে সুখ অর্থলোলুপ ছগমলের ছিল না। বোধ হয় কুবেরের ধন পাইলেও তাহার অসীম

আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত না। অপরকে প্রবঞ্চিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে যেন তাহার তৃপ্তি হইত না। নিখিলচন্দ্র তাহাদের কয়লার খনিতে চাকুরি করিত। নিখিলের সহিত ছগ্‌মলের বন্ধুত্ব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সেই বৎসর দুর্ভাগ্যক্রমে নিবারণের পত্নীবিয়োগ হইল। যে উদ্দীপনা প্রাণে লইয়া সে কার্য্য করিতেছিল, তাহা ভূমিসাৎ হইল। ছগ্‌মল্ ও নিখিলের সহিত নিবারণ মিশিল। সুরেন্দ্র একাকী কেমন করিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্রের বাহিরে থাকিবে। সেও তাহাদের সহিত একমত হইল। এবার প্রবঞ্চনা ছাড়িয়া তাহারা দস্যুতা করিতে কৃতসঙ্কল্প। কোলিয়ারির সন্নিকটে, এক বিধবার নিকট প্রায় দুই লক্ষ টাকা ছিল। অর্থপিশাচ চারিজন সিদ্ধান্ত করিল, তাহার ভরণপোষণের জন্য সামান্য অর্থ ফেলিয়া রাখিয়া বাকী সম্পত্তি হস্তগত করিতে পাপ নাই। তাহারা বিধবার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। এখন তাহারা চারি লক্ষ টাকার মালিক। কে আর পরিশ্রম করিতে চায়? বিশেষ নিবারণের পৃথিবীতে মোটেই কোন মমতার বস্তু ছিল না। তাহারা প্রায় সমস্ত অর্থ সুরেন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রাখিল। সুরেন্দ্র সেই যৌথ সম্পত্তি লইয়া দেশে চলিয়া গেল। ইহারা তিনজন পশ্চিমের নানা স্থানে ঘুরিল। সুরেন্দ্র অর্থ পাঠাইয়া দিত; ইহারা আপনাপন বাসনা ও প্রবৃত্তি অনুসারে সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। ছগ্‌মলের ক্রোরপতি হইবার বাসনা মিটিল না; সে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিল, আর কার্য্যাভাবে নিবারণও তাহার সহিত যোগ দিল।

এবার তাহারা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অর্থের অপব্যয় করিতে লাগিল। তাহাদের ভাণ্ডারী সুরেন্দ্রনাথ তাহাদের দ্যূতক্রীড়ার জন্য অর্থ সরবরাহ করিতে চাহিল না। পরস্পরের মধ্যে একটা কলহের সৃষ্টি হইল। সে আজ দেড় বৎসরের কথা। সুরেন্দ্রনাথ দেশ ছাড়িয়া কোথায় পলাইল, নিবারণের দলের কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। তখন তাহাদের মধ্যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তাহাদের সঞ্চিত অর্থের অংশ আদায় করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর হইল। সংসারে নিবারণের কোনও বন্ধন ছিল না। সে বাল্যসুহৃৎ সুরেন্দ্রের ব্যবহারে জ্বলিয়া উঠিল; প্রতিহিংসার জন্য সে দেশবিদেশে ঘুরিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিবারণের বুদ্ধি খুব প্রখর। সে সিদ্ধান্ত করিল, যখন সুরেন্দ্রের বিবাহোপযোগ্যা কন্যা আছে, তখন তাহাকে নিশ্চয় বাঙ্গালা দেশে থাকিতে হইবে। তাই সে বাঙ্গালাদেশে অনুসন্ধানে যাইল। শেষে সে যশোহরে সুরেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। তাহার সহিত চাক্ষুষ সাক্ষাতে একটা বিষম কাণ্ড বাঁধিতে পারে বলিয়া সে সুরেন্দ্রকে এক পত্র লিখিল। পত্রের ভাষাও তাহার স্মরণ ছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সাফল্য

বলা বাহুল্য আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত নিবারণের ইতিহাস শ্রবণ করিতেছিলাম। ঠিক যেন উপন্যাসের কথা। এরূপ কাহিনী যে বাস্তবজগতের তাহা যেন বিশ্বাস হইল না। অথচ যেরূপ আবেগময়ী

ভাষায় নিবারণ তাহার জীবনের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিল; তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না। আমার অবস্থা প্রায় নবীন বিচারপতির মত হইয়াছিল। যখন প্রথমে ফরিয়াদীর উকীল বক্তৃতা করেন তখন নবীন বিচারপতি ভাবেন ইহার কথার প্রত্যেক বর্ণটি সত্য, আসামীটা শয়তানের অবতার। আবার আসামী পক্ষের বক্তৃতার সময় আসামীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, মনে হয়, পৃথিবীতে লোকে নিরপরাধ ব্যক্তির এমন নির্য্যাতনও করিতে পারে? পূর্ব্বে সুরেন্দ্রবাবুর পক্ষ লইয়া নিবারণ ও তাহার সঙ্গীদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল, কিসে তাহাদের পাপের শাস্তি দিতে পারি সে কথা পুনঃ পুনঃ ভাবিতেছিলাম, প্রতি পদে পদে বিপদের মুখে ছুটিতেছিলাম। এখন কিন্তু তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল। মনে হইতেছিল, এ দলের মধ্যে প্রধান অপরাধী সুরেন্দ্রনাথ। ইহারা তাহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহার নির্য্যাতন করিতেছিল, আপনাদের পাপার্জ্জিত অর্থের অংশ পাইবার জন্য তাহার কন্যা অপহরণ করিয়াছিল, তাহার প্রাণনাশের প্রয়াস করিয়াছিল। পত্রের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম—"আচ্ছা আপনি যে চিঠি লিখেছিলেন—সে কি ভাষায়?" নিবারণ বলিল—"আপনি চিঠিখানি হস্তগত করেছেন বুঝি?" আমি বলিলাম—"হাঁ।" সে বলিল —"সে এক সাঙ্কেতিক বর্ণমালা। আমরা নিজেদের মধ্যে সেই অক্ষর ব্যবহার করতাম। চিঠির ভাষা অবধি আমার স্মরণ আছে। পত্রে লিখেছিলাম—"কতদিন লুকিয়ে থাকবে। খবর

পেয়েছি! যদি মা রফা কর প্রাণে মারব, ৭ নং দয়েহাটায় খবর পাবে।" আমি তাড়াতাড়ি জামার কফে কথাগুলি লিখিয়া লইলাম। নিবারণ বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল,—"হ্যাঁ সেই কথাই ভাল। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ও বর্ণমালা কাকেও শেখাতে পারবো না। কথাগুলা নিয়ে আসলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আপনার মত বুদ্ধিমান্ লোক নিশ্চয় আমাদের বর্ণমালাটা, বুঝে ফেলবেন।" পত্র পাইয়া সুরেন্দ্র কি করিল জানিতে চাহিলাম। নিবারণ দৃঢ়স্বরে বলিল,—সুরেন্দ্র নিজের চিতা সাজাইল। সে যে শয়তানের অবতার, তাহার পূর্ণপরিচয় দিল। লিখিল,—আমরা অনেক অর্থ অপব্যয় করিয়াছি, আমাদের স্ত্রীপুত্র নাই। আমরা সামান্য ভরণপোষণের জন্য তিনজনে পাঁচ হাজার করিয়া পনের হাজার টাকা পাইতে পারি। চারিলক্ষের তিন ভাগ পনের হাজার! কি ভীষণ শয়তান! কি ন্যায়নিষ্ঠা! নবাবের আমল হইলে তাহার ডালকুত্তার ব্যবস্থা হইত।" আমি কোন কথা বলিলাম না। নিবারণ বলিল—"যদি শুধু এই অবধি বলিয়া স্থির হইত তাহা হইলেও কি করিতাম বলিতে পারি না। রাবণ রাজার মত তাহার অতি দর্প হইয়াছিল। সে টাকার গরমে গুমরাইয়া মরিতেছিল। সে লিখিয়াছিল, যদি অধিক আস্ফালন করি, তবে ইংরাজের আইন আমাদিগের উষ্ণশোণিত শীতল করিবে! ইংরাজের আইন! ইংরাজের আইন আমলে আসিলে আজ আমাদের সহিত তাহাকে আন্দামানে বাস করিতে হইত। ইংরাজের আইন!" বুঝিলাম ক্রোধে নিবারণের অন্তর্দাহ হইতে-

ছিল। কিন্তু তাহার মুখের ভাব স্থির, গম্ভীর! আমি কথাটা উল্টাইবার জন্য বলিলাম—"আচ্ছা তা হ'লে সুরেন্দ্রবাবু প্রকাশ্য ভাবে বাস করছিলেন কি করে?" নিবারণ বলিল—"কে প্রকাশ্যভাবে বাস করিতেছিল! কুক্কুরের সে সাহস ছিল? সে জানিত আমরা চিরকাল পশ্চিমে বাস করি, আমাদের পক্ষে যশোরের মত সহর খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব হইবে। প্রকাশ্য ভাবে থাকিলে লোকের সন্দেহ কম হয়। আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে একটু লুকাইবার চেষ্টা করিলে অমনি কথা জন্মায়, পাঁচজনে কানাকানি করিতে আরম্ভ করে। সে বেশ সাহেবির ভান করে সহরের মধ্যে অথচ লোকালয়ের বাহিরে বাস করিতেছিল।" যুক্তিটা আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আমি দেখিয়াছিলাম,যে সকল অপরাধী কলিকাতার সহরে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া থাকে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা বড় কঠিন। তাহার পর নিবারণ মুরলার কথা বলিল। সে বলিল—"দুই চারিদিন তাহার বাঙ্গালার ধারে ঘুরিয়া দেখিলাম মুরলা প্রত্যহ প্রভাতে অবনীর বাগানে ফুল তুলিতে যায়। কয়েক দিন দেখিলাম অবনীও তাঁহার সহিত একটু আলাপ পরিচয় করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। শুনিলাম ধনীগৃহে তাহার বিবাহ হইবে। তাহাকে আটক করিয়া সুরেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ পাইবার জন্য একদিন তাহাকে চুরি করিলাম। আমাদের দ্বারা যে এ কার্য্য হইয়াছিল, আপনার মত বুদ্ধিমান্ লোক বোধ হয় প্রথমাবধি তাহা বুঝিয়াছিলেন।" তাহার কথায় একটু শ্লেষ ছিল। আমার উপস্থিত প্রাণভয় ছিল

না। তাই একটু সাহস করিয়া বলিলাম,--"যে দিন সুরেন্দ্র বাবু আমাকে প্রথম নিযুক্ত করেন সে দিন দলবল সমভিব্যাহারে আপনি আমাদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা—" নিবারণ বাধা দিয়া বলিল—"যাক্ আর বৃথা বাক্য ব্যয় ক'রে লাভ নেই, এখন আমাদের কথাটা শুনুন। আমরা বেশী কিছু চাহি না। তিন জনের তিন লক্ষের স্থলে এক লক্ষ টাকা। তার মেয়ে ছেড়ে দে'ব, তাকে অভয় দান করব, কোন প্রকারে তাকে বিরক্ত করব না। আর আপনাকে বল্‌ছি, আমি নিজে হয়ত পরে ঐ টাকা মুরলাকে দিয়ে আবার সুরেনের সংসারে বাস করব। আমার আর পৃথিবীতে কে আছে? কিন্তু সুরেন্দ্রের পরাজয় চাহি। তাকে এখন লক্ষ টাকা দিতে হ'বে, আর আমাদের কাছে মাফ্ চাইতে হ'বে।" আমি বলিলাম—"আর যদি সে সম্মত না হয়।" নিবারণের মুখের ভাব বিকৃত হইল না। সে গম্ভীর ভাবে বলিল —"তা'হলে আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি তার কাজে হাত দেবেন না, কারণ আজ হতে পনেরো দিনের মধ্যে যদি সম্মত না হয়, তা হলে তাকে, তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিজ হস্তে বিনাশ করব। আর যদি আপনি তাদের দলে থাকেন—" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। নিবারণ কথা শেষ করিল না। নিখিল বলিল—"দু'খানা কাপড় দিতে পারেন?" আমি বলিলাম—"কাপড় কেন?" নিবারণ বলিল—"আপনাকে বাঁধব বলে। রাগ করবেন না। মানুষের মন না মতি। এখন আপনি সব শুনলেন। এখনই হয়ত আমাদের পিছনে চীৎকার করে একটু দৌড়াদৌড়ি কর্‌বেন। হয়ত পুলিশ

ডাকবেন।” আমি অগত্যা তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। তাহারা কেবল আমার হাত পা বাঁধিয়া সন্তুষ্ট হইল না। আমার মুখের মধ্যে কতকটা কাপড় প্রবেশ করাইয়া দিল যাহাতে আমি চীৎকার করিতে না পারি। নিবারণ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল—“আপনার ভৃত্যটি আমাদের অনেক টাকা খেয়েছে, সে আধ ঘণ্টা পরে আপনাকে খুলে দেবে। তা হ’লে মনে ক’রে রাখবেন আজ থেকে পনেরো দিন সময়। আপনি চিন্তিত হ’বেন না। স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। কিন্তু কবে আর কোথায় সাক্ষাৎ হবে, তা বলব না।” তাহারা তিন জনে আমাকে নমস্কার করিল। নিবারণ দরজা খুলিয়া যেমন বাহির হইল, অমনি জন কয়েক লোক তাহাকে চাপিয়া ধরিল। গোলমালে অপর দুই জন পলায়ন করিল। দেখিলাম আগন্তুকদিগের দলপতি নরেশচন্দ্র। তাহার উত্তেজিত অথচ বিজয়-গর্ব্বিত মুখখানি দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ

বড় আনন্দের দিন। পরম শত্রু নিবারণ বন্দী! কলিকাতায় নিজেদের ঘরে বসিয়া আবার দুই বন্ধুতে বহুদিন পরে নিশ্চিন্ত মনে চা পান করিতেছিলাম। নরেশ বলিল—“দেখলে বাবা, এ কেসে বাহাদুরী কার, তোমার না আমার? সুরেন্দ্র বাবুর মান রক্ষা করলাম, নিবারণকে বন্দী করলাম, শুধু তাই নয় ওদের

বর্ণমালাটাও মেরে নিয়েছি।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "বল কি! কি করে করলে?" নরেশ হাসিয়া বলিল—"যদি দস্তুরদস্তুর করো তো বলব মন্ত্রবলে, আর যদি এক কথায় জান্‌তে চাও তো বলি—ঘুমের ঘোরে।" "ঘুমের ঘোরে!" নরেশ বলিল—"হ্যাঁ ভাই, ঘুমের ঘোরে, জানত ঘুমের ঝোঁকে সব জিনিস একটু লম্বা হ'য়ে যায়। আমি সে দিন চেয়ারে ব'সে ঢুলছিলাম। চিঠিখানা হাতে ছিল, অক্ষর গুলা যেন লম্বা হ'তে লাগলো। ফাঁক আছে দেখলাম—যেন ফাঁকগুলা জুড়ে গেল। ঠিক মাথার মধ্যে এসে গেল বর্ণমালাটা কি?" আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সেন বলিল—"লেখাগুলা বাঙ্গালা, প্রত্যেক অক্ষরের কতকটা ক'রে কথা ছেড়ে দিয়েছে বলে অমন বিশ্রী বর্ণমালার সৃষ্টি হ'য়েছে!" আমি বলিলাম—"সত্য নাকি? বল কি?" রমেশ বলিল—"এই দেখনা, এই প্রথম চিঠি খানা নাও।

এতে লেখা আছে—কতদিন লুকিয়ে থাকবে? খবর পেয়েছি। যদি না রফা কর, প্রাণে মারবো, ৭নং দয়েহাটায় খবর পাবে।" ঠিক নিবারণ ঐ কথা গুলাই বলিয়াছিল। সে বলিল, "এই দেখ-প্রথম অক্ষরটাতে কেবল একটা দাঁড়ি বাদ দিয়েছে!" আমি চিঠিখানা হাতে লইয়া তাহার কথার যাথার্থ্য অনুভব করিলাম। ঠিক্ কথা। প্রত্যেক অক্ষরের এক একটা লাইন ভাঙ্গিয়া তাহারা এই অদ্ভুত বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা বিচিত্র মনুষ্যমূর্ত্তি, এক একটা গ্যাস পোষ্ট, ইহাদেরই বা অর্থ কি? নরেশ বলিল, "এ গুলা নিরর্থক।

কেবল ধাঁধাঁর জন্য।" আমি বলিলাম "আচ্ছা দ্বিতীয় পত্র খানা বাহির কর দেখি।" নরেশ দ্বিতীয় পত্র খানি বাহির করিল।

আমি একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া পড়িলাম, তাহাতে লিখিত ছিল "নিখিল কার্য্য যেন খুব সাবধানে করা হয়। সুরেন তার কেসটা সেন ডিটেক্‌টিভদের হাতে দিয়েছে। আমাদের গতি যেন তাহারা না লক্ষ্য করে। গোয়েন্দাদের চৌকী দিও। মুরলা যেন সুখে থাকে। যদি না শুনে তবে খুন খুন খুন নিবারণ।" বড় বিস্মিত হইলাম ? এ পত্র খানা প্রথমে পড়িতে পারিলে আর অবনীর সহিত ঘুরিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইত না। পত্রখানা প্রথমেই সুরেন্দ্র বাবুকে দেখাইলে কতকটা সুফল ফলিত। কিন্তু ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রম্। নরেশ বলিল "তোমাকে উদ্ধার করেছি ভাগ্য বলে। সেই কেসটার সংবাদ দেবার জন্যে ছুটে গয়ায় গেলাম। যখন তোমার গলির কাছে গেলাম দেখলাম তুমি দুজন লোকের সঙ্গে বাড়ীতে গেলে। ঠিক তোমাদের পিছনেই নিবারণ ঢুকল। আমি কালবিলম্ব না করে একেবারে থানা থেকে লোক জন এনে তবে নিবারণকে ধরলাম। আর দুমিনিট বিলম্ব হ'লেই বাস্।" আমরা গল্প করিতে করিতে সুরেন্দ্র বাবুর বাসায় গেলাম। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া সুরেন্দ্র বাবু আনন্দে বিভোর হইলেন। তাঁহার প্রধান শত্রু এখন পিঞ্জরাবদ্ধ। আমি আর তাঁহাকে এখন নিবারণের সকল কথা বলিলাম না। নরেশচন্দ্র আমাকে ডাকিয়া

অপর একটি কক্ষে লইয়া গেল। সর্ব্বনাশ! দুইটী প্রায় এক রকমের কিশোরী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। একটি সরলা, অপরটি নিশ্চয় মুরলা। আমি বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলিলাম "মুরলা!" মুরলা হাসিল। বলিল "এবার সত্য মুরলা।" আমি বলিলাম "পেলে কোথা?" সে বলিল "হঠাৎ এক দিন মাণিকতলার কাছে ছগ্মনের সাক্ষাৎ পাই। তাকে অনুসরণ করে বাগমারির একটা বাগানের দ্বার অবধি এলাম। সর্ব্বদাই ভিতর থেকে বাগানের দরজা বন্ধ থাকতে দেখে পুলিশ নিয়ে বাগানে প্রবেশ করি। বালিকাকে বেশ সুখে রেখেছিল।" মুরলা হাসিয়া বলিল "হাঁ খুব সুখে রেখেছিল।" আমি বলিলাম "কাকেও ধরেছ?" নরেশ বলিল "কাকেও ধরা হয় নি। একটা বুড়া দাসী ছিল। তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" বাহিরে গিয়া দেখিলাম, প্রিয়নাথ—চিন্তিত মুখে আমি বলিলাম—"কি প্রিয়নাথ?" সে বলিল—"কাল রাত্রে নিবারণ হাজতের মধ্যে আত্মহত্যা করেছে।" আমরা বিস্মিত হইলাম। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখে দুই ফোঁটা জল দেখা দিল। আমি বলিলাম—"যাক্ এ ব্যাপারের এইখানেই যবনিকা পড়ুল।" নরেশ বলিল—"দাঁড়াও এখনও বাকী আছে, আগামী সোমবার অবনী ও মুরলার বিবাহ।"

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

—মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুস্তকই প্রকাশিত হয়—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই, আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহান্ উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৮/০ লাগিবে। একত্রে ১০ দশখানি পুস্তক লইলে, ডাকব্যয় লাগে না; মোট ৫/০ ও ভি পি ফি /০ পড়ে।

১। অভাগী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ
৩। পল্লীসমাজ (৯ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
৬। চিত্রালী (২য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
৯। বড়বাড়ী (৮ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)— শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী সম্পাদক

৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল

৪৮। ছবি (৩য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৯। মনোরমা (২য় সং)—শ্রীমতী সরসীবালা বসু

৫০। সুরেশের শিক্ষা (২য় সং)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৪। দেওয়ানজী (২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর (২য় সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

৫৬। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

৫৭। হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর

৫৮। বোঝাপড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব

৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা

৬১। গৃহ-কল্যাণী—(২য় সংস্করণ) শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি

৬৩। প্রতিভা—শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত

৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল

৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ

৬৬। পাখীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ,এম-এ

৬৭। চতুর্ব্বেদ (সচিত্র)—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন

৬৮। মাতৃহীন—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী

৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল

৭২। জীবন সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা